BANSDOC Library
Dhaka

নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুন, ২০১৭

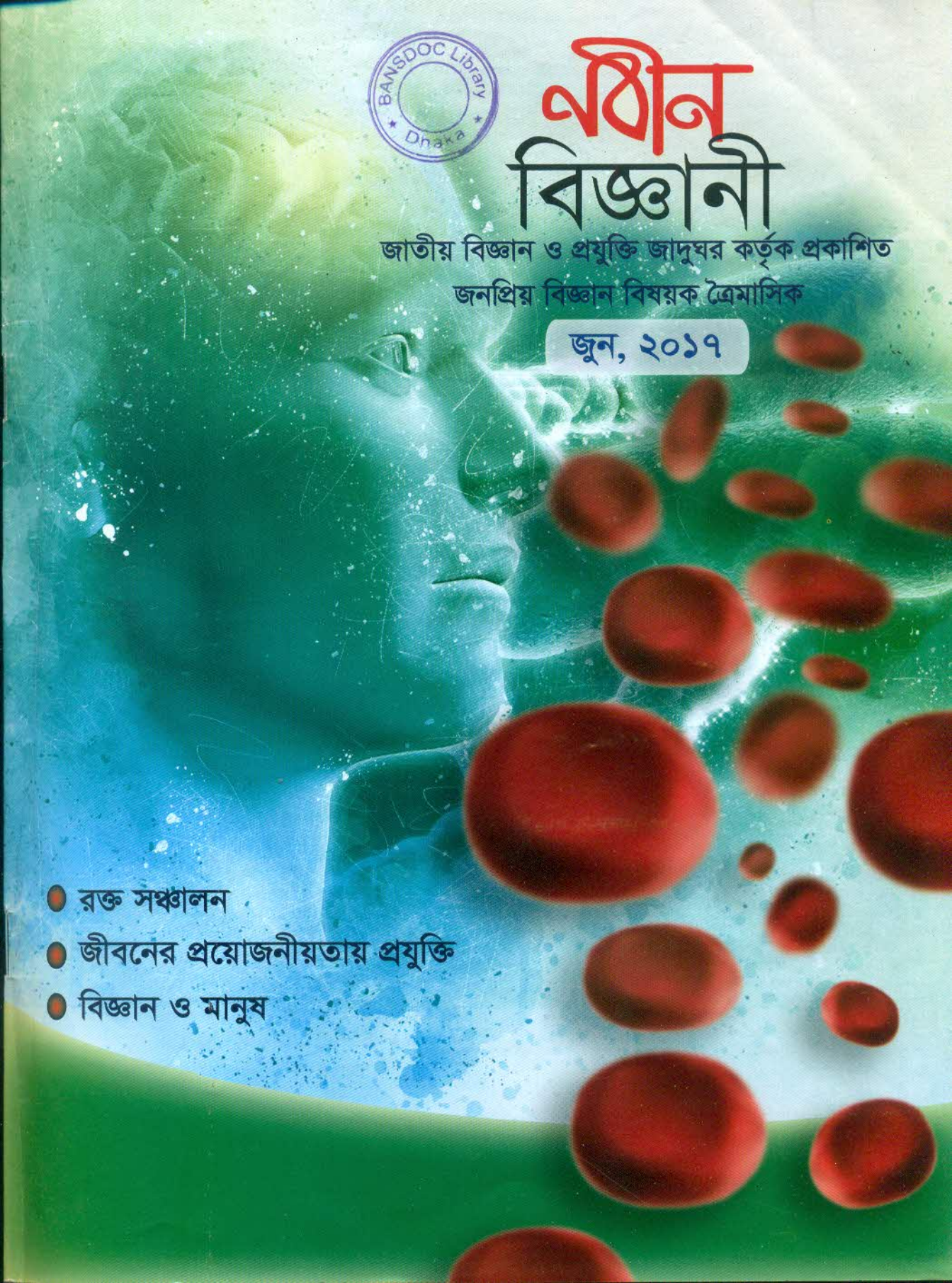

- রক্ত সঞ্চালন
- জীবনের প্রয়োজনীয়তায় প্রযুক্তি
- বিজ্ঞান ও মানুষ

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী

জুন, ২০১৭ সংখ্যা

BANSDOC Library
Dhaka

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদক :
জনাব মো: বদিয়ার রহমান
সিনিয়র কিউরেটর
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
কিউরেটর (সার্বিক)
জনাব মো: কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান
জনাব মো: মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর
জনাব পপি মন্ডল
সহকারী লাইব্রেরিয়ান

প্রচ্ছদ :
জনাব রবিন বসাক আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা/মুদ্রণালয় :
এস. এম. এন্টারপ্রাইজ
২/১-এ, দারুস-সালাম
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
www.nmst.gov.bd

প্রকাশকাল : ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

সূচিপত্র

◆ রক্ত সঞ্চালন ১
– সৌমেন সাহা

◆ "লিখিল সাহিত্য, গ্রহগল্প যত, ১১
হলরে আজিকে মর্ত্য, বিস্মিত তত"
– মো: রিদওয়ানুর রহমান

◆ মেসিয়ের বস্তু : এম৩১ ২১
– শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী

◆ জলবায়ু পরিবর্তনে ছাদ কৃষির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা ২৩
– ড. মো: শরফ উদ্দিন

◆ জীবনের প্রয়োজনীয়তায় প্রযুক্তি ২৭
– প্রকৌশলী মো: টিপু সুলতান

◆ যেভাবে এল আমাদের প্রচলিত বর্ষপঞ্জিগুলো ৩০
– হোসনে আরা পারভীন

◆ আমাদের শহরে সবজি ও ফল চাষ ৩৭
– কে এম আলী রেজা হেলাল

◆ বিজ্ঞান ও মানুষ ৪৪
– অশোক কুমার নাথ

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে ট্রেসিং করে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।

প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক

"নবীন বিজ্ঞানী"

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২০৮৪

ই মেইল : infonmst@gmail.com

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

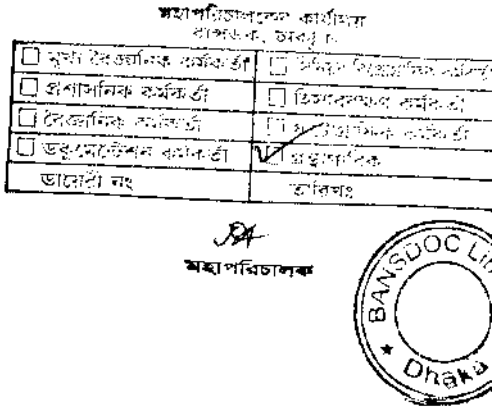

মহাপরিচালকের কার্যালয়
ডায়েরী নং
তারিখঃ
মহাপরিচালক
BANSDOC
Dhaka

মুখবন্ধ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা 'নবীন বিজ্ঞানী'র জুন ২০১৭ সংখ্যা প্রশাসনিক জটিলতার জন্য নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করছি। এ সংখ্যায় ৮টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান চর্চার এবং তাদের মেধা ও উদ্ভাবন চর্চার সাথে সম্পৃক্ত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকাশনা তরুণ প্রজন্মের মনন শক্তি বিকশিত করবে।

এ প্রকাশনায় প্রবন্ধ পাঠিয়ে যে সকল গুণগ্রাহী প্রবন্ধকার প্রকাশনাটি সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ। সকলের সহযোগিতায় প্রকাশনার মানবৃদ্ধি ও কলেবর আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা রাখি।

(স্বপন কুমার রায়)
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

রক্ত সঞ্চালন
(Blood Transfusion)

সৌমেন সাহা

এক মানুষের রক্ত আর একজনকে দেওয়ার প্রচেষ্টা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড লোয়ার সর্বপ্রথম প্রাণীর দেহে এই ভাবে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবহার করেন। তবে মানুষের রক্ত মানুষের দেহে সর্বপ্রথম সঞ্চালন করেন ব্লান্ডেল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। উইলিয়াম হার্ভে শরীরের রক্তপ্রবাহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তখনও রক্ত কীভাবে মানুষের উপকারে লাগে, কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ত সঞ্চালনের দরকার, কীভাবে দেওয়া উচিত, রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই বা কী হতে পারে-এসব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ছিল না। তখনকার সময়ে রক্ত সঞ্চালনের বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না, সুতরাং রক্ত সঞ্চালনের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এমন কি মৃত্যুর ঘটনা খুবই বেশী ছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ল্যান্ডস্টিনার প্রত্যক্ষ করলেন যে মানুষের রক্তের বিভিন্ন শ্রেণী আছে- এটিই বিখ্যাত ABO System নামে বহুল প্রচারিত। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ল্যান্ডস্টিনার এবং উইনার আর একটি Rh System এর প্রবর্তন করেন। এছাড়াও মানুষের রক্তের আরও অনেক শ্রেণীবিভাগ হয়েছে, তবে দৈনন্দিন রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এই ABO Syetem এবং Rh System-এই দুটিই বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। আধুনিককালে এই রক্ত সঞ্চালন যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই করা হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং কুশলী চিকিৎসকের পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানে রক্ত সঞ্চালন এখন অনেক বেশী নিরাপদ এবং সহজসাধ্য। যথার্থ প্রয়োজনে রোগীকে রক্ত সঞ্চালন করে অনেক সময় অনেক রোগীর পুনরুজ্জীবন ঘটে।

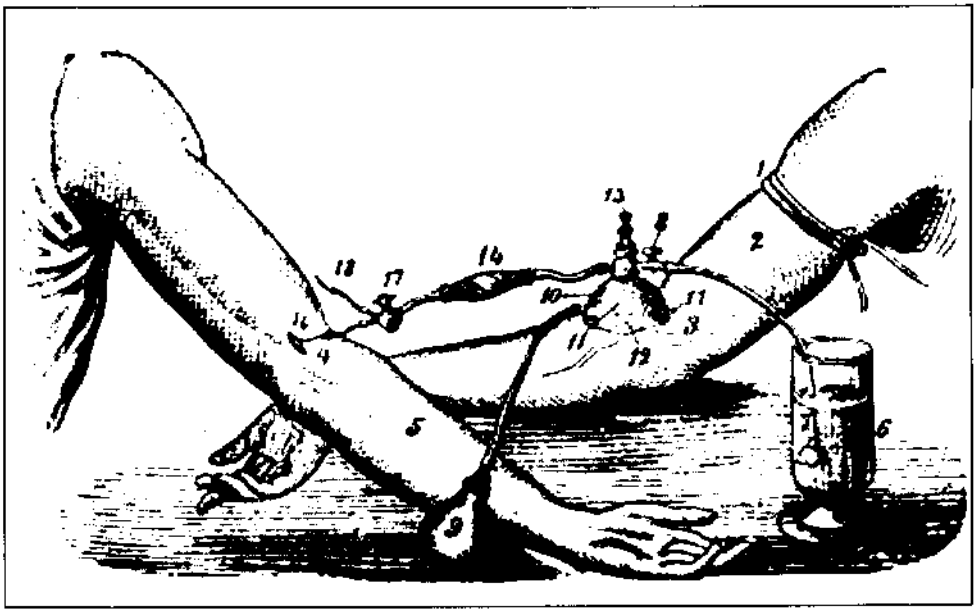

আধুনিককালে এই রক্ত সঞ্চালন যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই করা হয়

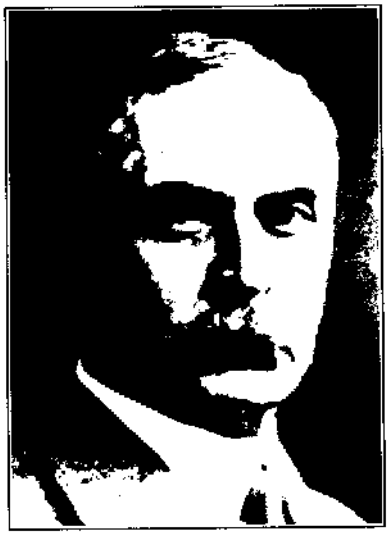

কার্ল ল্যান্ডস্টিনার

সর্বপ্রথম রক্ত সঞ্চালনের আবিষ্কারক রিচার্ড লোয়ার

এ বি ও পদ্ধতি (ABO System) ঃ

এই শ্রেণীবিন্যাসে মোট ৪ রকমের রক্ত হতে পারে-O, A, B এবং AB। O শ্রেণীর রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টি A ও অ্যান্টি B দুই অ্যান্টিবডিই থাকে; A শ্রেণীর রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টি B এবং B শ্রেণীর রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টি A অ্যান্টিবডি থাকে। সেইমত AB রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টি A বা অ্যান্টি B কোন অ্যান্টিবডিই থাকে না সাধারণভাবে বলা হয় রোগীর রক্ত যদি AB হয় তবে যে কোন শ্রেণীর রক্ত নিতে পারে আর O শ্রেণীর রক্তের লোক যে কোন শ্রেণীর রোগীকে রক্ত দিতে পারে। অ্যান্টি A এবং অ্যান্টি B অ্যান্টিবডিগুলি এমনিতেই শরীরে থাকে. শিশুদের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে পরোক্ষভাবে মায়ের কাছ থেকে পায়। তবে ৩ থেকে ৬ মাসের পর তারা নিজেরাই নিজেদের অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। এরা কিভাবে সঠিক অ্যান্টিজেন না থাকা সত্ত্বেও এই অ্যান্টিবডি তৈরি করে তা সঠিক জানা যায় নি।

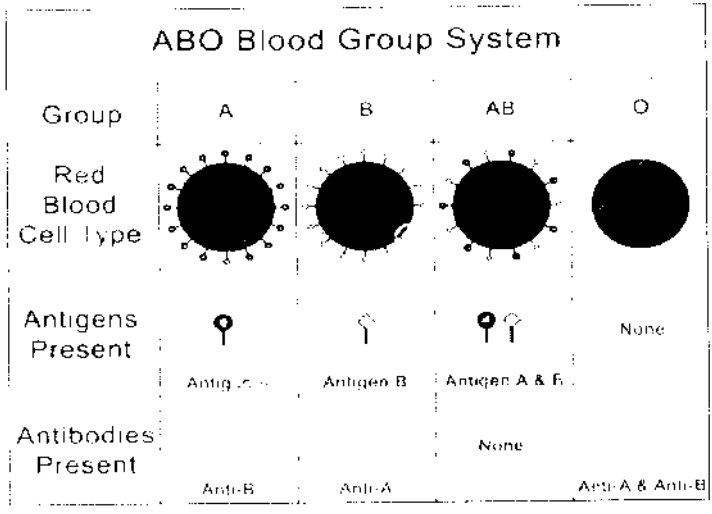

যাই হোক, রক্ত সঞ্চালনের সময় দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই রক্তের শ্রেণী বিচার বিবেচনা করা উচিত এবং cross matching test করা উচিত। এই পরীক্ষায় গ্রহীতার রক্তের সিরাম এবং দাতার রক্ত কণিকার অ্যান্টিবডি মেশানো হয় এবং দেখা হয় কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিনা। যদি গ্রহীতার রক্তের সিরামে অ্যান্টিবডি থাকে তবে ছানা কাটার মত agglutination হবে এবং সেক্ষেত্রে সে রক্ত রক্ত-সঞ্চালনের উপযুক্ত নয়।

রেসাস পদ্ধতি (Rhesus System) ঃ

এই রক্তের শ্রেণীবিন্যাসে বেশ জটিলতা আছে। তবে সহজভাবে ধরা যায় যে এতে ৬টি অ্যান্টিজেন থাকতে পারে যেমন C, D, E এবং c, d, e। সাধারণতঃ Rh পজিটিভ বা নেগেটিভ ধরা হয় যখন D অ্যান্টিজেন রক্তে আছে অথবা নেই। শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ লোকের রক্ত কণিকায় D অ্যান্টিজেন থাকে, সুতরাং তারা Rh পজিটিভ। বাকী অন্যরা Rh নেগেটিভ। যদি Rh পজিটিভ রক্ত কোন Rh নেগেটিভ রোগীকে সঞ্চালন করা হয় সেক্ষেত্রে গ্রহীতার রক্তে অ্যান্টি D তৈরি হয় এবং পরবর্তী Rh পজিটিভ রক্ত সঞ্চালনে নানারকমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটি Rh নেগেটিভ গর্ভবতী মায়ের যদি গর্ভস্থ সন্তান Rh পজিটিভ হয় তবে সেক্ষেত্রেও এই দুই অসম শ্রেণীর রক্তের প্রভাবে অ্যান্টি D তৈরি হয় এবং গর্ভস্থ সন্তান খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

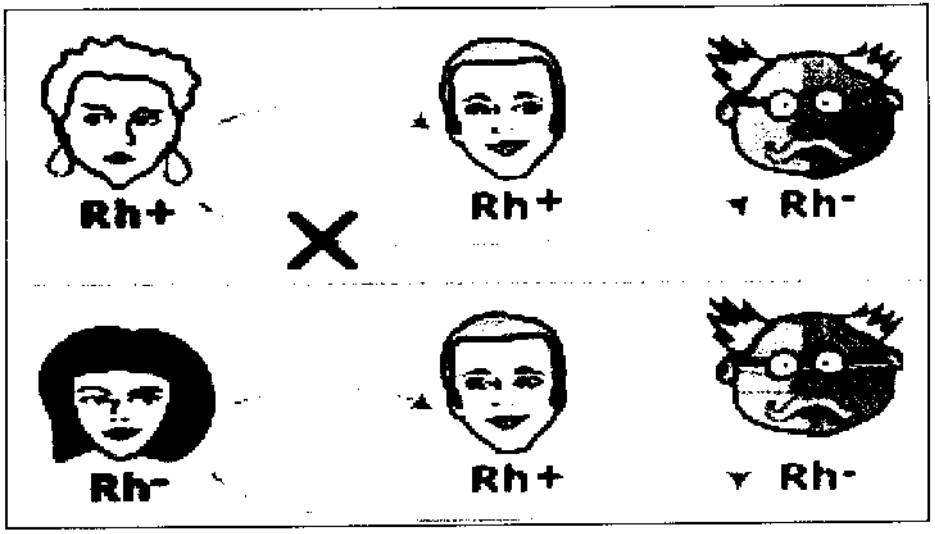

যদিও প্রধানতঃ D ফ্যাক্টরই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি তৈরি করে তবে অন্য Rh অ্যান্টিজেনও তা করতে পারে এবং অনেক সময়েই এতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। একই সঙ্গে অ্যান্টি C, অ্যান্টি D এবং অ্যান্টি E থাকতে পারে। গ্রহীতা বা রোগীর ক্ষেত্রে শুধু D অ্যান্টিজেন আছে কিংবা নেই সেটি দেখেই সাধারণতঃ তার Rh ফ্যাক্টর ঠিক করা হয়। তবে রক্তদাতার ক্ষেত্রে তাদের D ছাড়াও C এবং E অ্যান্টিজেন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা দরকার। একমাত্র সেই প্রকৃতপক্ষে Rh নেগেটিভ যার রক্তে C, D এবং E অ্যান্টিজেন নেই। Rh অ্যান্টিজেন বিশেষভাবে রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যেই থাকে, শ্বেত কণিকা বা অন্য কিছুতে এর বিশেষ অস্তিত্ব নেই।

এই AOB System এবং Rh System ছাড়াও অনেক পদ্ধতিতে রক্তকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তবে তাদের বাস্তব ব্যবহার খুবই সীমিত।

রক্তগ্রহণ এবং রক্ত সংরক্ষণ ঃ

সাধারণভাবে রক্তদাতার বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যেই হওয়া উচিত। তবে আমাদের দেশে ৫৫ বছরের বেশী রক্তদাতার বয়স হলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। রক্তগ্রহণের আগে দাতার সাধারণ স্বাস্থ্য ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। রোগীর রক্তাল্পতা থাকলে, ভাইরাল হেপাটাইটিস (viral hepatitis), ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যৌন ব্যাধি, বা কোন রকমের সাংঘাতিক এলার্জির অসুখ থাকলে সেই দাতার রক্তগ্রহণ না করাই শ্রেয়। যক্ষ্মা বা ক্যানসার রোগীর রক্ত নেওয়া হয় না। রক্তদাতার হিমোগ্লোবিন লেভেল অন্ততপক্ষে শতকরা ৮৫ ভাগ থাকা উচিত।

একথা অবধারিত সত্য আমাদের দেশে একেকবারে ২৫০ থেকে ৩০০ মিলিলিটার রক্ত দাতার শরীর থেকে নেওয়া হয় এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকারী কোন মানুষের পক্ষেই তা ক্ষতিকর নয়। তবে রক্ত দানের পরই অধিক শ্রম করা উচিত নয়, অন্ততঃপক্ষে কাজে যাওয়ার আগে এক রাত্রি পূর্ণ বিশ্রাম অত্যন্ত প্রয়োজন।

রক্ত নেওয়ার সময় রোগীকে বেশ আরামে চিৎ করে শুতে দেওয়া হয়। রোগীর সাধারণতঃ বাম হাতের উপরিভাগে স্ফিগমো ম্যানোমিটারের কাফ (sphygmo manometer cuff) অথবা টুনিকেট ভালভাবে বাঁধা হয়। তারপর কনুই এর সামনের চামড়া ভালভাবে আয়োডিন, স্পিরিট দিয়ে পরিস্কার করে একটি ভাল শিরায় একটি নির্দিষ্ট ছুঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে অল্প লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ঐ জায়গায় দিয়ে নিলে ব্যথা কম হয়।

সাধারণভাবে কাচের বোতলে এই রক্ত রাখা হয়। এই বোতল এবং রক্ত নেওয়ার সরঞ্জাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগে থেকেই জীবাণুমুক্ত রাখা হয়। বোতলের ছিপির দিকটিও সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হওয়া একান্ত দরকার এবং এখানেও আলাদা মোড়ক দেওয়া থাকে। ব্যবহারের আগে সেই মোড়ক খুলে ফেলা হয়।

এই বোতলে রক্ত সংরক্ষণের জন্য preservative হিসাবে এসিড সাইট্রেট ডেক্সট্রোজ অথবা সাইট্রেট ফসফেট ডেক্সট্রোজ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে রক্ত ঠিক স্বাভাবিক তরল অবস্থায় থাকে এবং বেশ কিছুদিন মোটামুটি কার্যকরী অবস্থায় থাকে। ২ গ্রাম ডাইসোডিয়াম সাইট্রেট এবং ৩ গ্রাম ডেক্সট্রোজ ১২০ মিলিলিটার জলে মিশিয়ে এসিড সাইট্রেট ডেক্সট্রোজ তৈরি করা হয়। এটি বহুদিন থেকেই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে। এর ব্যবহারে ২১ দিন সংরক্ষণের পরেও অন্ততঃ ৭৫ ভাগ লোহিত কণিকা ভাল থাকে। অবশ্য আধুনিককালে সাইট্রেট ফসফেট ডেক্সট্রোজ এবং সাইট্রেট ফসফেট ২ ডেক্সট্রোজ এডেনিন আরও সাফল্যজনক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

এই বোতলে একটি দিকে বাতাস যাওয়া আসার জন্য একটি টিউব থাকে। অন্যদিকে রক্তদাতার শিরা থেকে রক্ত টিউব দিয়ে বাহিত হয়ে সোজাসুজি বোতলের মধ্যে আসে। স্ফিগমো-ম্যানোমিটারের প্রেশার ২০ মি.মি. মার্কারী তুলে রাখলে রক্ত ভাল ভাবে আসে। রক্তদাতা সেই হাতের মুঠি একটু খোলা এবং বন্ধ করলেও রক্ত প্রবাহ ভাল হয়। যখন রক্ত নেওয়া হয় তখন পরে পরীক্ষার জন্য pilot স্যাম্পেল রক্ত রাখা হয়। রোগীর শিরা থেকে ছুঁচ খুলে নিয়ে সেখানে ভালভাবে অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং দেওয়া হয়।

রক্তের বোতল ভালভাবে সীল (seal) করে, নথিভূক্ত করে, লেবেল করে বিশেষভাবে তৈরি রেফ্রিজারেটারে রাখা হয়। এখানে এটি ৪° থেকে ৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় থাকবে। প্লাস্টিক ব্যাগেও রক্ত রাখা হয় এবং এতে রক্তের লোহিত কণিকা, অনুচক্রিকা এবং প্লাজমার সংরক্ষণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। তবে এতে যদি দৈবক্রমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে তবে রক্তের ক্ষতি করতে পারে। প্লাসটিক ব্যাগ থেকে রোগীকে রক্ত সঞ্চালন করলে খুব বেশী air embolism হওয়ার সুযোগ থাকে না কেননা এতে সহজ রক্ত প্রবাহের জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয় না।

রক্ত সংরক্ষণের ফলে রক্তের কিছু পরিবর্তন হয়ই এবং সেই পরিবর্তন যতই দিন যায় ততই বাড়তে থাকে। সাধারণতঃ রক্তদাতার শরীর থেকে রক্ত নেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে রোগীকে দিলে তাকে fresh blood transfusion বা তাজা রক্ত সঞ্চালন বলে। এতে রক্তের সব উপাদান অনেকাংশে বজায় থাকে। সংরক্ষিত রক্তের লোহিত কণিকায় এডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) পটাশিয়াম, ২, ৩ ডাইফসফোগ্লিসারেট কমে যায় লোহিত কণিকার গ্যাস পরিবহনের ক্ষমতা কমে যায়, দেখতেও অনেক গোলাকার হয়ে পড়ে। এই রক্তের প্লাজমায় পটাশিয়াম এবং অ্যামোনিয়া অত্যন্ত বেড়ে যায়, সাইট্রেট এবং ল্যাকটিক এসিড বেড়ে যায়। এতে মুক্ত হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও বেড়ে যায়। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য ফ্যাক্টর ৫ এবং ৭ কমে যায়, এমন কি থাকেই না। শ্বেতকণিকা এবং অণুচক্রিকা সংখ্যায় অনেক কমে যায়, তাদের কার্যক্ষমতাও নষ্ট হয়। সংরক্ষিত রক্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জমাট (microaggregates) দেখা যায়।

এই সবই গ্রহীতার শরীরে ক্ষতি করতে পারে অথবা রক্ত সঞ্চালনের আশানুরূপ ফল না দিতে পারে। সংরক্ষিত রক্তের বোতলে সব সময় তার group, ক্রমানুপাতিক সংখ্যা, নষ্ট হওয়ার তারিখ (expiry date) দেওয়া থাকে। সেই তারিখের পর ঐ রক্ত কখনোও রক্ত সঞ্চালনের পক্ষে উপযুক্ত থাকে না এবং এটি ভুলক্রমে দিলেও অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

মৃত ব্যক্তির রক্ত বের করে নিয়ে সংরক্ষণ করা যায় এবং অন্য রোগীর দেহে সঞ্চালন করা যায়। এ নিয়ে রাশিয়ায় সাফল্যজনকভাবে অনেক কাজ হয়েছে, অবশ্য এটি সবদেশে চালু পদ্ধতি নয়। যে সব রোগী হঠাৎ হার্টের অসুখে, ইলেকট্রিক শক্ ইত্যাদিতে মারা যায়- তাদের মৃত্যুর ৬ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে ২ থেকে ৪

লিটার রক্ত অনায়াসে বের করে নেওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় রক্ত তরলই থাকে পরেও কোন anticoagutant ওষুধ preservative (সংরক্ষক) হিসাবে লাগে না। মৃত্যুর পরে fibrinolysis এর জন্য রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। এইভাবে সংগৃহীত রক্ত ৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা হয়, তবে ৫ দিনের মধ্যেই এর ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

এখন কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত কারণেই রক্ত সঞ্চালন করা হয় ঃ

১। কোন দুর্ঘটনায় আঘাত পেলে, অত্যধিক রক্তপাত ঘটলে অপারেশনের সময়ে, আগুনে পুড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, রোগীর শরীরে মোট রক্তের পরিমাণ অনেক কমে যেতে পারে। সেই ঘাটতি মেটানোর জন্য রোগীকে রক্ত দেওয়া দরকার। একটি পূর্ণবয়স্ক সাধারণ স্বাস্থ্যের মানুষের ৮০০ থেকে ১০০০ মিলিলিটার রক্তপাত ঘটলে রক্তছাড়া অন্য জলীয় পদার্থ, গ্লুকোজ সলিউশন, ডেক্সট্রীন ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। তবে এর চেয়ে বেশী রক্তপাত ঘটলে এবং অল্প সময়ে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হলে তাকে রক্তের সাহায্যেই চিকিৎসা করা একান্ত কর্তব্য। অনেক সময় রক্তই রোগীর পুনরুজ্জীবন ঘটায়। রোগীর রক্তের জলীয় ভাগ অত্যধিক কমে গেলে প্লাজমা দিয়েই তার চিকিৎসা করা যেতে পারে। বিশেষতঃ পুড়ে যাওয়া রোগীর ক্ষেত্রে এটি খুবই প্রযোজ্য।

২। রোগীর রক্তাল্পতা থাকলে অর্থাৎ রক্তে হিমোগ্লোবিন অত্যধিক কমে গেলে রক্ত সঞ্চালন করে অনেক সময় তার চিকিৎসা করা হয়। অবশ্য লৌহ ঘটিত ওষুধ, ফলিক এসিড, ভিটামিন B_{12} এসব দিয়েও এর ভাল চিকিৎসা হয়। তবে এতে কাজ না হলে এবং খুব তাড়াতাড়ি সুফল পেতে হলে আলাদা ভাবে প্যাকড লোহিত কণিকা সঞ্চালন করার দরকার হয়। রোগীর রক্তাল্পতা যত বেশী হয় রক্ত সঞ্চালন তত সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত। এদের রক্ত সঞ্চালনের ফলে রক্তপ্রবাহে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং তার ফলে congestive heart failure বা pulmonary oedema হতে পারে। রক্তাল্পতার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন acute haemolytic anaemia বা aplastic anaemia- তে রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত জরুরী চিকিৎসা।

৩। রোগীর রক্তে শ্বেতকণিকার ঘাটতি হলে, অনুচক্রিকার ঘাটতি হলে, albumin, fibrinogen বা y-globulin এর ঘাটতি হলে অনেক সময় তাজা রক্ত সঞ্চালনের দরকার হয়। অবশ্য রক্তের এই উপাদানগুলি যদি আলাদাভাবে পাওয়া যায় এবং ঠিক কী উপাদানের ঘাটতি তা যদি ভালভাবে নির্ণয় করা যায় তবে সেই বিশেষ উপাদান দিয়েই চিকিৎসা করা বিধেয়। অন্যথায় রোগীকে পুরো রক্ত সঞ্চালন করেই চিকিৎসা করা হয়।

৪। রোগীর রক্তের জমাট বাঁধার কোন বৈষম্য থাকলে, রোগীর রক্তে অণুচক্রিকা বা clotting factors এর অভাব থাকলে অনেক সময়ই তাজা রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। রোগীর শরীরে immune bodies এর ঘাটতি পূরণেও রক্ত সঞ্চালনের দরকার আছে।

রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার ঃ

রোগীর রক্তের গ্রুপ ঠিকভাবে দেখা হয় এবং পরে রক্ত দাতার রক্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে cross matching করা হয়। এই পরীক্ষায় যদি দুই রক্তের মিশ্রণে কোন তারতম্য না ঘটে তবে সেই রক্তই নির্দিষ্ট রক্ত সঞ্চালনের জন্য বিবেচিত হয়। অবশ্য Rh factor-ও এর সঙ্গে দেখে নেওয়া হয়।

রোগীকে বিছানায় শুইয়ে সাধারণতঃ তার হাতের শিরাপথে রক্ত সঞ্চালন করা হয়। সংরক্ষিত রক্তের লেবেল দেখে, তার expiry date দেখে, রোগীকে পরীক্ষা করে, তার হাসপাতালের টিকিট পরীক্ষা করে ভালভাবে দেখে নেওয়া হয় যাতে কোন ভুল রক্ত না দেওয়া হয়ে যায়। সংরক্ষিত রক্তে যদি কোন রকমের গন্ডগোল মনে হয় তবে তা সঞ্চালনের আগেই ঠিক করে নেওয়া উচিত। Haemolysed রক্ত কখনই সঞ্চালনের উপযুক্ত নয়। সংরক্ষিত রক্ত যদি খুব ঠান্ডা হয় তবে রোগীর স্বাভাবিক তাপমাত্রার কাছাকাছি এনেই তা সঞ্চালন করা হয়।

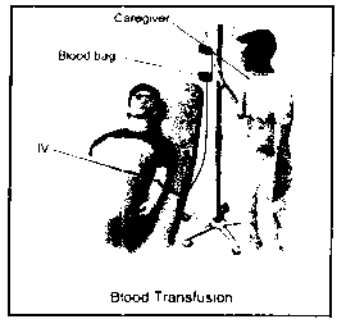

রক্ত সঞ্চালনের সরঞ্জাম নিখুঁত এবং জীবাণুমুক্ত থাকা একান্ত দরকার। উপযুক্ত চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে রক্ত সঞ্চালন করা উচিত। নতুবা আকস্মিক উপসর্গ দেখা দিলে রোগীর বিপদ ঘটতে পারে। খুব জরুরি না হলে অধিক রাত্রে বা অন্য কোন বাজে সময় রক্ত সঞ্চালন করা ঠিক নয়। রোগীর কাছাকাছি প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ঔষধপত্র থাকাও একান্ত দরকার।

রক্ত সঞ্চালনের সময় রোগীকে বারবার পরীক্ষা করা উচিত। তার নাড়ী, শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তচাপ ইত্যাদিতে কোন হেরফের হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। রক্ত যেমন খুব আস্তে দেওয়ার দরকার নেই তেমনই খুব তাড়াতাড়ি রক্ত দেওয়াও উচিত নয়। অত্যধিক কম সময়ে অধিক রক্ত দিলে রোগীর বিশেষ ক্ষতি হতে পারে।

এখন দেখা দরকার রক্ত সঞ্চালনের ফলে কোন কোন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেগুলি কেন হয় এবং কীভাবে এসবের চিকিৎসা করা হয় তাও সম্যক জানা দরকার। রক্ত সঞ্চালনের কুফলগুলি মোটামুটি দুইভাবে ভাগ করা হয়। এর প্রথমটি রক্ত সঞ্চালনের সময়ে বা অব্যবহিত পরেই ঘটতে পারে আর দ্বিতীয়টি রক্ত সঞ্চালনের অনেক পরে এমন কি কয়েক সপ্তাহ পরে ঘটতে পারে।

তাৎক্ষণিক উপসর্গ বা কুফল ঃ

১। রক্ত সঞ্চালনের সময় অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা কিছু বাড়তে দেখা যায়। এই তাপবৃদ্ধির সঙ্গে রোগীর কাঁপুনি হতে পারে, বমি বমি ভাব থাকতে পারে, মাথা ধরা থাকতে পারে। সাধারণতঃ রক্ত সঞ্চালনের সরঞ্জাম ঠিকমত জীবাণুমুক্ত না করার জন্যই এটি হয়। জীবাণুমুক্ত প্লাসটিক ব্যাগ ব্যবহার করলে তাপবৃদ্ধির ঘটনা অনেক কমে। তবে সঞ্চালিত রক্তের শ্বেতকণিকা এবং অণুচক্রিকা রোগীর অ্যান্টিবডির প্রভাবে immunologic reaction এর ফলেও তাপবৃদ্ধি খুব একটা ক্ষতি করে না। এসবক্ষেত্রে রোগীকে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখলে ভাল হয়। দরকার হলে অ্যাসপিরিন বা ঐ জাতীয় ওষুধ দিলে জ্বর কমে যায়।

২। অনেক সময় রক্ত সঞ্চালনের জন্য অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। শরীরের চামড়ায় rash হতে পারে। গায়ে চুলকানির মত হতে পারে। Angioneurotic oedema এমনকি হাঁপানি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ রোগীর যদি আগে থেকেই কোন অ্যালার্জি থাকে-তারই বেশি এরকম হতে দেখা যায়। সঞ্চারিত রক্তের অ্যান্টিজেন প্রভাবে রোগীর শরীরে এই ধরনের অ্যালার্জি হয়। এই অ্যালার্জির জন্যও রোগীর জ্বর হতে পারে, রক্তচাপ খুব কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীকে antihistaminic ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। প্রতিষেধক হিসাবে রক্ত সঞ্চালনের আগেই এই ওষুধ দেওয়া যায়।

৩। রক্তে বীজাণু সংক্রমণ থাকলে বা রক্ত সঞ্চালনের সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত হয়ে পড়লে রোগীর শরীরে নানারকমের Septic reaction ঘটতে পারে। এদের মধ্যে gram negative endotoxemia এবং septicemia বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতেও খুব জ্বর, কাঁপুনি, রক্তচাপ হ্রাস, বমি হতে পারে। হৃৎপিন্ডের এবং কিডনীর বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। সুতরাং রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্রপাতি ঠিকমত বীজাণুমুক্ত করা একান্ত দরকার।

৪। রোগীর যদি হৃৎপিন্ডের অসুখ থাকে, যদি রক্তল্পতায় ভোগে, যদি sepsis বা toxaemia থাকে তবে রক্ত সঞ্চালনের ফলে তাদের রক্তপ্রবাহ অত্যধিক বেড়ে যেতে পারে (circulatory overloading)। সেক্ষেত্রে রোগীর হঠাৎ congestive cardiac failure বা oedema হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে খুবই সাবধানে রক্ত সঞ্চালন করা দরকার। এতে রোগীর প্রথম দিকে মাথা ভারি বোধ হতে পারে, বুকে ব্যথা হতে পারে, নিঃশ্বাসে কষ্ট হতে পারে। রোগীর গলার শিরাগুলি ফুলে ওঠে। রক্ত সঞ্চালন তখনই বন্ধ করা দরকার। দরকার হলে diuretics, digitalis ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

৫। রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সব থেকে খারাপ উপসর্গ দেখা দেয় যখন সঞ্চালিত রক্ত রোগীর রক্তের সঙ্গে মিশে ভেঙ্গে যেতে থাকে (haemolytic reaction)। এটির প্রধান কারণ যদি দাতা এবং গ্রহীতার রক্তে গরমিল থাকে (specific incompatibility)। তবে রক্ত যদি অত্যধিক ঠান্ডা হয়, যদি নির্ধারিত তারিখের পর রক্ত সঞ্চালন করা হয়, যদি রক্ত অত্যধিক গরম হয়ে যায়, যদি রক্ত জীবাণুযুক্ত হয়ে পড়ে-তবে সেই রক্ত সঞ্চালনে রোগীর শরীরে এই haemolysis হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রোগীর মাথাব্যথা, কাঁপুনি, অল্প জ্বর, বুকে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, নাড়ীর গতিবৃদ্ধি, রক্তচাপ হ্রাস-এই সব দেখা দেয়। পরে প্রস্রাবে হিমোগ্লোবিন পাওয়া যায়। জন্ডিস হতে পারে, প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যেতেও পারে। এতে রোগীর মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

এই সব উপসর্গ দেখে যদি কখনও incompatible রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে মনে হয় তবে তৎক্ষণাৎ ঐ রক্ত দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া দরকার। অন্য কোন solution শিরাপথে দিতে হবে-৫% গ্লুকোজ সলিউশন হলেও চলবে। রোগী মুখে খেতে পারলে বেশি জল খেতে দেওয়া উচিত। রোগীর রক্ত এবং বোতলের অবশিষ্ট রক্ত আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো দরকার। রোগীর প্রস্রাবও পরীক্ষা দরকার। রোগীর নাড়ী, রক্তচাপ, শ্বাস প্রশ্বাসের দিকেও নজর রাখতে হবে। দরকার মত প্রস্রাব বাড়ানোর জন্য diuretics দিতে হতে পারে।

৬। রোগীর শরীরে অত্যধিক রক্ত সঞ্চালন (massive blood transfusion) অনেক সময়েই বিপত্তি ঘটাতে পারে। রোগীর শরীরের মোট রক্তের অর্ধেক পরিমাণ রক্ত যদি সঞ্চালন করা হয় এক ঘন্টা বা তারও কম সময়ে অথবা ২৪ ঘন্টা বা তার কম সময়ে রোগীর মোট রক্তের পুরো রক্তই যদি দেওয়া হয় তবে তাকে massive transfusion বলা হয়। এই অত্যধিক রক্ত সঞ্চালনে শরীরে অনেক পরিবর্তন ঘটাতে পারে ঃ

(ক) সংরক্ষিত রক্তের প্লাজমায় অত্যধিক পটাশিয়াম থাকায় রোগীর শরীরে পটাশিয়ামের আধিক্য ঘটে।

(খ) সংরক্ষিত রক্ত বেশি অম্ল হওয়ায় এবং এর সঙ্গে সাইট্রেট ডেক্সট্রোজ থাকার জন্য রোগীর metabolic acidosis হতে পারে।

(গ) সংরক্ষিত রক্তে অ্যামোনিয়া বেশি থাকায় রোগীর ক্ষতি হতে পারে বিশেষতঃ রোগীর লিভারের অসুখ থাকলে।

(ঘ) সংরক্ষিত রক্তে সাইট্রেট থাকার জন্য রোগীর সাইট্রেট বিষক্রিয়া হতে পারে (citrate intoxication) : সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। প্রথম দেড় লিটার রক্ত সঞ্চালনের পর প্রতি ৫০০ মিলিলিটার রক্তের জন্য ৫ থেকে ১০ মি.লি. ১০% ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড শিরাপথে দেওয়া হয়। এতে সাইট্রেট বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(ঙ) সংরক্ষিত রক্ত অত্যধিক ঠান্ডা (৪° সেন্টিগ্রেড) হওয়ার জন্য রোগীর দেহের তাপ হ্রাস ঘটতে পারে।

(চ) অত্যধিক রক্ত সঞ্চালনের ফলে রোগীর শরীরে অধিক রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। সংরক্ষিত রক্তে অণুচক্রিকা অত্যন্ত কম থাকে, কিছু clotting factor বিশেষতঃ ফ্যাকটর ৫ এবং ৭ কম থাকে। তাছাড়া রোগীর নিজের রক্তও অত্যন্ত তরল হয়ে পড়ে। এই সব কারণেই বেশী রক্তক্ষরণ হয়। এই অত্যধিক রক্ত সঞ্চালনের সময় রোগীকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। দরকার মত supportive treatment করা একান্ত জরুরি।

৭। রক্ত সঞ্চালনের সরঞ্জামে কোন গন্ডগোল থাকলে, পজিটিভ প্রেশারে রক্ত সঞ্চালনের সময় air embolism ঘটতে পারে। খুব অল্প বাতাস রক্ত প্রবাহে চলে গেলে বিশেষ ক্ষতি হয় না তবে অসুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে ১০-৪০ মি.লি. বাতাস রোগীর মৃত্যু ঘটাতে পারে।

রক্ত সঞ্চালনের বিলম্বিত কুফল এবং উপসর্গ ঃ

১। Rh পজিটিভ রক্ত যদি নেগেটিভ শরীরে সঞ্চালন করা হয়, তবে তখন কোন উপসর্গ দেখা দেয় না। কিন্তু রোগী sensitised অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তী রক্ত সঞ্চালনের সময় বিপত্তি দেখা দেয়।

২। যদি রোগীর শরীরে অ্যান্টিবডি খুব কম থাকে তবে রক্ত সঞ্চালনের সময় কিছু না হলেও, ৩-৪ দিন পরে উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তখন রক্ত কণিকা অল্পস্বল্প ভেঙ্গে যেতে থাকে-পরে রোগীর জন্ডিস হতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে উপসর্গের প্রকোপ খুব একটা বেশি হয় না।

৩। বেশ কিছু অসুখ রক্তের সাহায্যে রোগীর দেহে সংক্রামিত হতে পারে। এদের মধ্যে সিরাম হেপাটাইটিস, ম্যালেরিয়া এবং সিফিলিসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এছাড়াও কালাজ্বর, trypanosomiasis bacteriaemia, septicaemia ইত্যাদিও হতে পারে। সুতরাং রক্ত দাতাদের ভালভাবে বাছাই করেই তবে রক্ত নেওয়া উচিত। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে এদের প্লাজমা ব্যবহার করা গেলেও রক্তকণিকা কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য যেসব জায়গায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব খুবই বেশি সেখানে এসব প্রশ্ন বেশি ওঠার কথা নয়। সিফিলিস রোগীর বীজাণু স্পাইরোকিট ৪° সেন্টিগ্রেডে ৪-৫ দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এসব রোগীর তাজা রক্ত সঞ্চালন করা একেবারেই উচিত নয়। কখনও সিফিলিস রোগীর রক্ত রোগীকে দেওয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা করা দরকার এবং পরেও তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

৪। বারবার বহুদিন রক্ত সঞ্চালন করলে রোগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লোহাজাতীয় পদার্থ জমা হতে পারে। একে রক্ত সঞ্চালনজাত haemosiderosis বলা হয়। Aplastic রক্তাল্পতায় রোগী বহু বছর ধরে বহুবার রক্ত পায়-তাদের এই haemosiderosis বেশি ঘটে।

৫। যে শিরাপথে রক্ত সঞ্চালন করা হয় সেখানে অনেক সময় প্রদাহের সৃষ্টি হতে পারে। এই thrombophlebitis-এরও আশু চিকিৎসা বিধেয়।

এই সব রক্ত সঞ্চালনজাত কুফল এবং উপসর্গগুলি অনেক সময় মারাত্মক হয় এবং রোগীর জীবন বিপন্ন হয়। এগুলি প্রতিরোধ করার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

১। রক্তদাতা ঠিকমত বাছাই করা দরকার।

২। রোগীকেও ঠিকমত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একান্ত প্রয়োজন হলেই রক্ত সঞ্চালন করা দরকার।

৩। রক্তের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।

৪। রক্ত সঞ্চালন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত। এই সময় রোগীর দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

৫। কোন উপসর্গ হলে তাৎক্ষণিক নির্ণয়ন এবং চিকিৎসা অবশ্য কর্তব্য।

৬। রক্ত সঞ্চালনকে কখনই মামুলি বলে ধরা উচিত নয়। এর গুরুত্ব বুঝেই রক্ত সঞ্চালন করা উচিত।

প্রবন্ধকার : জনপ্রিয় লেখক ও গ্রন্থকার, সাধারণ সম্পাদক, প্রাণিক বিজ্ঞানাগার, খুলনা।

"লিখিল সাহিত্য, গ্রহগল্প যত,
হলরে আজিকে মর্ত্য, বিস্মিত তত"

মোঃ রিদওয়ানুর রহমান

সাহিত্য হচ্ছে এক প্রকারের লিখন-শিল্প, যা ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক ও মহাজাগতিক চিন্তন, অনুভূতি, সৌন্দর্য, এবং শিল্পের লিখিত শব্দসমষ্টি। গদ্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, পুরাণ, দার্শনিক রচনা, প্রবন্ধ, ইত্যাদি হল সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ ধরণ কিংবা শাখা। একজন প্রকৃত সাহিত্যিক তাঁর হৃদয়ের নয়ন দিয়ে একটি অরূপ বস্তুকে নিজের মত করে রূপ প্রদান করে থাকেন। অন্যদিকে, বিজ্ঞানীদের কতিপয় বৈজ্ঞানিক মননগুলো স্বভাবত স্বতন্ত্র হতে পারে, কিন্তু সেই মননগুলিকে একরকম বর্ণাঢ্য রূপ দিয়ে সহায়তা করে সাহিত্যের রকমারি কল্পনাশক্তি। তাই সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার এই ছোট্ট প্রবন্ধটি আমাদের সৌরজগতের সেই সকল গ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছে, যারা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই বিশাল জগতে স্বগর্বে এবং শক্তিশালীরূপে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে।

বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে প্রথম যে মানুষটি আলোর পথ দেখান, তিনি হলেন পিথাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০ – ৪৯৫ অব্দ)। তিনি মূলত গণিদবিদ হলেও, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তার যথেষ্ট অবদান আছে। বস্তুত, তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন যে, আমাদের এই পৃথিবী এবং গ্রহ নিজ নিজ অক্ষের চারিদিকে আবর্তিত হচ্ছে। যদিও, তার এই অভিমতকে কেউ গ্রহণ করেনি। বিশ্বতত্ত্বের জ্যামিতিক কাঠামো নির্মাণের পথপ্রদর্শক হিসেবে পিথাগোরাস প্রাচীন গ্রিসের যে যুক্তিসম্মত গাণিতিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধারার শেষ গ্রিক মনীষী হচ্ছেন অ্যারিস্টার্কাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০–২৩০ অব্দ)। অ্যারিস্টার্কাসকে প্রাচীন গ্রিসের কোপার্নিকাস নামে অভিহিত করা হয়, কারণ তিনিই সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। তিনি নিজ গবেষণার জন্য তৈরি করেছিলেন উন্নত ধরনের সূর্য-ঘড়ি ও যন্ত্রপাতি। সত্যি বলতে, তার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ছিল নিজস্ব ও মৌলিক। সৌরজগতের রহস্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে তিনি আদৌ দার্শনিক প্রতীতির উপর নির্ভর করেননি। ফলস্বরূপ, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন যে, সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। এ থেকেই বোধ হয়, তার মনে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে বলে ধারণা হয়েছিল।

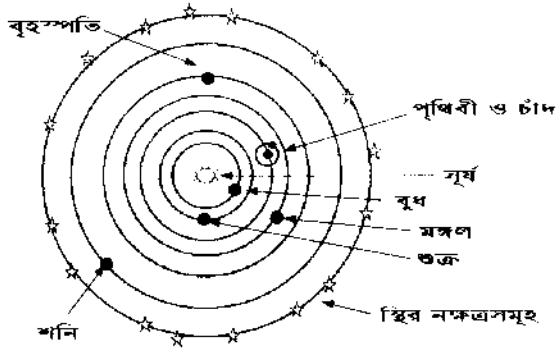

অ্যারিস্টার্কাস প্রণীত সৌরজগতের প্রতিমান

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, পিথাগোরাস থেকে অ্যারিস্টার্কাস পর্যন্ত প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানের যে ধারাটি অগ্রসর হয়েছিল, তার যবনিকাপাত ঘটে ঠিক ওই সময়েই। যার প্রকৃত কারণ ছিল, তিন বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৯ – ৩৯৯ অব্দ), প্লেটো (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭ – ৩৪৭ অব্দ), এবং অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ – ৩২২ অব্দ)। প্রকৃতপক্ষে, এই তিন কিংবদন্তী দার্শনিকের প্রবল প্রতাপে শুষ্ক দার্শনিক চিন্তাধারার এবং প্রায়োগিক বিজ্ঞানের উন্মেষের পথটিকে রুদ্ধ করে ফেলে। যার ফলে, অ্যারিস্টার্কাসের নাম কিছু সময়ের জন্য অন্ধকারে তলিয়ে যায়। এরপর সৌভাগ্যক্রমে, অ্যারিস্টার্কাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদটি প্রাচীন গ্রিসের নামজাদা পণ্ডিত আর্কিমিডিস (খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৭ – ২১২ অব্দ) তার বালুকাময় কালের পরিগণক (The Sand Reckoner) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন। কিন্তু তারপরও, অ্যারিস্টার্কাসের মতবাদটি তার গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি।

পারস্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত ওমর খৈয়াম (১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ – ১১৩১ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ এবং অন্যদিকে ছিলেন একজন সুদক্ষ কবি। তার রচিত রুবাইয়াৎ ফারসি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। রুবাইয়াৎ অর্থ 'চতুষ্পদী স্তবক'। সত্যি বলতে, রুবাইয়াৎ হল কতগুলো চতুষ্পদী কবিতার সম্ভার। তিনি প্রায় এক হাজার চতুষ্পদী কবিতা লিখেছেন। তবে, তার জীবদ্দশায় কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি। পারস্যের বাইরে, ইংরেজ পণ্ডিত টমাস হাইড সর্বপ্রথম ওমর খৈয়ামের উপর গবেষণা করেন। এছাড়াও, ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর বহু বছর পর, ১৮৫৯ সালে প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি ও লেখক এডওয়ার্ড ফিটজিরেল্ড তার চতুষ্পদী কবিতাগুলো Rubaiyat of Omar Khayyam নামে অনুবাদ করে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। কার্যত, তিনি ওমর খৈয়ামের প্রায় ছয়শ চতুষ্পদী কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

ফিটজিরেল্ডের সেই অনুবাদটির বিশেষ সংস্করণের সম্পাদক অধ্যাপক জি. এফ. মেইন তার ভূমিকাতে বিস্মিত হয়ে পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন, তবে কি ওমর খৈয়াম জানতেন যে, পৃথিবী মহাশূন্য পরিভ্রমণ করে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এর সাথে, সমগ্র সৌরমণ্ডলও কি আরও বৃহত্তর মহাশূন্য পথে পরিভ্রমণ করছে? এই উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ওমর খৈয়ামের রচিত চতুষ্পদী কবিতাগুলোতে। বস্তুত, সেই কবিতাসমগ্রের একটি জায়গায়, তিনি কাব্যিক ভঙ্গিতে পৃথিবীসহ সৌরকেন্দ্রিক সকল গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার সেই জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত চতুষ্পদী কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হল:

"ঘূর্ণ্যমান ঐ কুগ্রহ-দল-সদাই যারা ভয় দেখায়–
ঘুরছে ওরা ভোজবাজির ঐ লণ্ঠনেরই ছায়ার প্রায়।
সূর্য যেন মোমবাতি আর ছায়া যেন পৃথিবী এই,
কাঁপছি মোরা মানুষ যেন প্রতিকৃতি আঁকা তায়।"

উপরে উদ্ধৃত চতুষ্পদী কবিতাটি হচ্ছে, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক বাংলায় অনূদিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম নামক গ্রন্থের ১৬৯ নং স্তবক। তথাপি, স্বাভাবিক ভাষায় প্রকাশ করলে এই স্তবকটির মর্মার্থ অনেকটা এভাবে দাঁড়ায়: "শয়তান গ্রহগুলি সর্বদা এভবেই ঘুরে ঘুরে ভয় দেখায়। ওরা (গ্রহরা) ঘুরছে ওই জাদুর প্রদীপ (সূর্য)-এর ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। সূর্য হল সেই মোমবাতি, যা পৃথিবীকে আলোকিত করে। এই সকল নৈসর্গিক দৃশ্য আমাদের মত সাধারণ মানুষদের জন্য ভীতিকর"। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, ওমর খৈয়াম কোপার্নিকাসের অনেক আগেই, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলির প্রদক্ষিণ

করার তত্ত্ব কাব্যিকরূপে উপস্থাপন করেন। যদিও, অ্যারিস্টার্কাসের মত ওমর খৈয়ামের চিন্তনও আঁধারে ঢাকা পড়ে যায়। কারণ, তার জীবদ্দশায় কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি। অধিকন্তু তার মৃত্যুর পর, তার কবিতাগুলো সঠিকভাবে ব্যাখা করার জন্য সেই সময় কেউ ছিলনা।

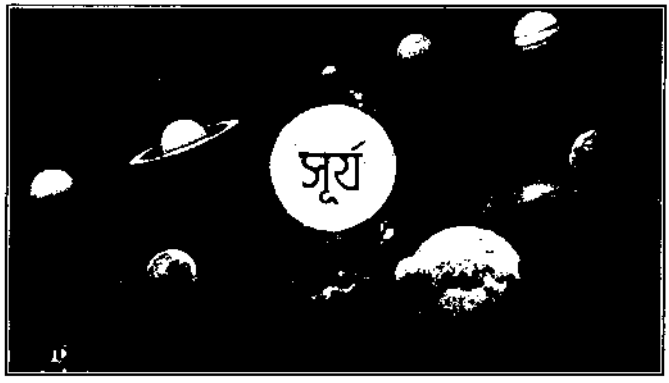

ওমর খৈয়ামের মননে সূর্যকে ঘিরে রেখেছে ঘূর্ণ্যমান গ্রহসমষ্টি

এবার স্বয়ং কোপার্নিকাসের প্রসঙ্গে আসা যাক। "সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে", বিশ্ববাসীর এই স্থির বিশ্বাসের মূলে যিনি আঘাত করেন, তিনি হলেন পোলিশ ধর্মযাজক নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দ – ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি ব্যক্তিগতভাবে গির্জার কাজের অবসরের মধ্যেই গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে, তিনি গবেষণা চালিয়ে যান। গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনি কখনই প্রকাশ করেননি। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে, তিনি জীবনব্যাপী পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার প্রকাশ করলেন তার যুগান্তকারী গ্রন্থ মহাজাগতিক বস্তুগুলির ঘূর্ণন (De Revolutionibus Orbium Coelestium) এর মাধ্যমে। এই বইটির প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল, পৃথিবী আপন অক্ষের চারিদিকে আবর্তনশীল। যদিও, প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিডিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯০ – ৩১০ অব্দ) প্রথম বলেন, পৃথিবী নিজ অক্ষের চারিদিকে লাটিমের মত ঘুরছে এবং পৃথিবীর এই আহ্নিক গতি আছে বলেই মনে হয় আকাশটা ঘুরছে। যাই হোক, কোপার্নিকাসের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল, সূর্যই কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং পৃথিবীসহ প্রতিটি গ্রহ নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে নিজ নিজ বৃত্তপথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে।

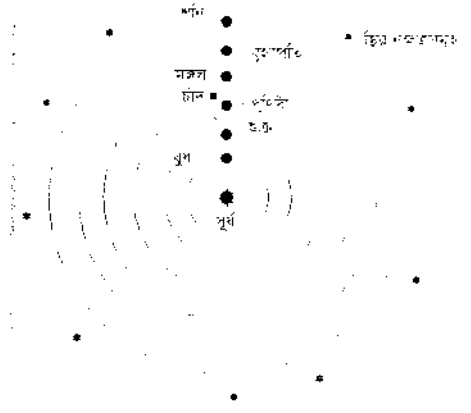

কোপার্নিকাস প্রণীত সৌরজগতের প্রতিমান

সূর্য যে নিজেও আবর্তনশীল, কথাটি অ্যারিস্টার্কাস, ওমর খৈয়াম, এবং কোপার্নিকাসের কাছেও ছিল অজানা। কেননা, তাদের সময়ে উন্নত মানের দূরবীক্ষণযন্ত্র উদ্ভাবিত হয়নি। ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে, ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ – ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ) একটি উন্নত মানের দূরবীক্ষণযন্ত্র তৈরি করেন। একদিন সূর্যের দিকে সেই দূরবীক্ষণযন্ত্র তাক করে দেখলেন, সূর্যের গায়ে রয়েছে কালো ছোপ। আর এই ছোপগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। এ থেকেই তিনি ধারণা করেন, সূর্য নিজেও আবর্তনশীল। এছাড়াও আমরা জানি যে, চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ এবং সৌরজগতের পঞ্চম বৃহত্তম উপগ্রহ। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক পারমেনাইডিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫১৫ – ৪৫০ অব্দ) গণিতবিদ পিথাগোরাসের দর্শন দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। যার ফলে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই এবং চাঁদ সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়, এ ধরনের নির্ভুল মতবাদ তিনি প্রচার করতেন। কার্যত, এই ধরনের জ্ঞান তিনি পিথাগোরীয় অনুসারীদের কাছ থেকে লাভ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। সে যাই হোক, পিরামিডাল কবিতার অনন্য স্রষ্টা কবি সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট শেখ আবর্তনশীল সূর্য ও চাঁদের আলো সম্পর্কে তার "কে সে জন?" কবিতায় রূপকাশ্রিতভাবে বলেন:

"চিরকাল তাপন ঘুরে, তার আপন কক্ষ জুরে, শুধুই দ্যুরে উদিত হয়,
প্রিয়ার আস্যে পাই খুঁজে সদা, উপমা শশীর, করেছে সুর যারে জ্যোৎস্নাময়।"

অতএব, "কে সে জন?" নামক পিরামিডাল কবিতা থেকে নেওয়া পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের বিজ্ঞানসম্মত অর্থ করলে, অনেকটা এভাবে দাঁড়ায়: "দ্যুরে (আকাশে) উদিত হওয়া তাপন (সূর্য) চিরকাল তার নিজের কক্ষপথে আবর্তনশীল। প্রিয়ার আস্যে (মুখমণ্ডলে) আমি সর্বদা খুঁজে পাই শশীর (চাঁদের) উপমা (তুলনা), যাকে সুর (সূর্য) করেছে জ্যোৎস্নাময় (আলোকিত)"। এবার আসা যাক, এই জ্যোতির্বিজ্ঞানসংক্রান্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের প্রকৃত রূপকধর্মী অর্থে। সুতরাং প্রথম পঙ্‌ক্তিতে, কবি নিজেকে সূর্য এবং নিজের প্রিয়তমাকে ঘিরে সকল আবেগজড়িত চিন্তাকে নিজের কক্ষপথ হিসেবে কল্পনা করেছেন। এর সাথে, সূর্য যেমন আকাশে প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনি তার প্রিয়তমার দুই নয়নের সামনে তিনি সূর্যের ন্যায় দেখা দেন। এরপর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে, কবি তার প্রেমিকার সুশ্রী মুখমণ্ডলকে সেই চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন, যাকে তিনি সূর্যরূপে সবসময় আলোকিত করেন তার সপ্রশংস বাণী দ্বারা। তথাপি, কবিতার পঙ্‌ক্তি দুটি কাব্যিক হলেও, তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক তাৎপর্য নিঃসন্দেহে বহন করে।

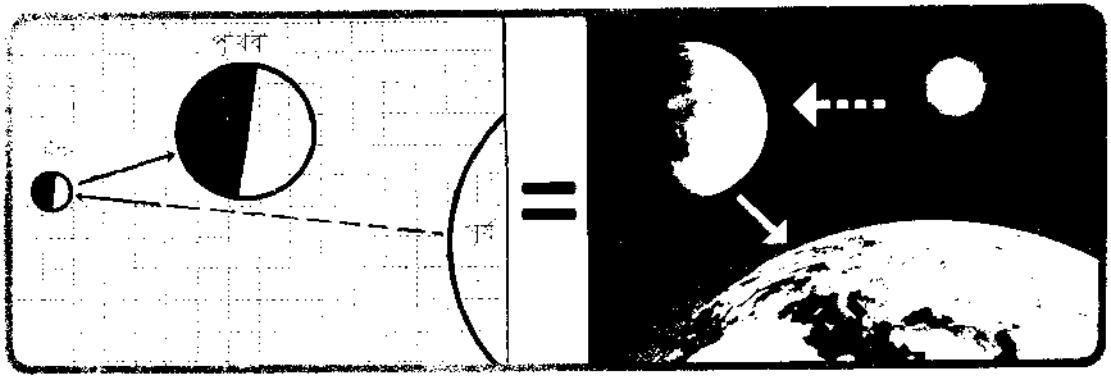

সূর্যের আলো নিয়ে রাত্রির আলোকিত চাঁদ

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ, প্রসিদ্ধ জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইওহানেস কেপলার (১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ - ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ) সন্দেহ করেছিলেন যে, মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহ আছে। যদিও, তিনি সেটা বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারেননি। সে যাই হোক, ইংরেজি অনার্সে অধ্যয়নের সময়, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে গালিভারের সফরনামা (Gulliver's Travels) নামক বিদ্রূপাত্মক গদ্য পড়তে হয়েছিল। চার খণ্ডের এই বৃহৎ গদ্যটি লিখেছিলেন বিখ্যাত এ্যাংলো-আইরিশ লেখক জোনাথন সুইফট (১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দ - ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)। তার এই কালজয়ী গদ্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে। তথাপি, সুইফটের লেখা আমার সেই পাঠ্য বইয়ের "লাপুটা ভ্রমণ" (তৃতীয় খণ্ড) নামক খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এরকম একটি বর্ণনা আছে:

"ওনারা (লাপুটার জ্যোতির্বিদগণ) দুটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র বা উপগ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যেগুলো মঙ্গলগ্রহের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে। এই দুটির মধ্যে কাছেরটি কেন্দ্রীয় ব্যাসের তিন গুণ দূরত্ব রেখে এবং দূরেরটি পাঁচ গুণ দূরত্ব রেখে নিজদের কক্ষপথে আবর্তিত হয়। প্রথমটির একবার ঘুরে আসতে দশ ঘন্টা এবং দ্বিতীয়টির একবার ঘুরে আসতে সাড়ে একুশ ঘন্টা সময় লাগে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তাদের আবর্তন কালকে বর্গমূল হিসাব করলে মঙ্গলগ্রহের কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্বের ঘণফল প্রায় সমানুপাতিক। ফলে, যে মহাকর্ষের প্রভাবে সকল জ্যোতিষ্ক যেভাবে চালিত হয়, এই দুটোও ঠিক একই নিয়মে চালিত হয়"।

আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী আসফ হল (১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দ – ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ) ১৮৭৭ সালের ১১ই আগস্ট রাতে মঙ্গলগ্রহের একটি ছোট উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। আরো কয়েক দিন পর, ১৭ই আগস্ট রাতে তিনি মঙ্গলগ্রহের বড় উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। পরবর্তিতে, ছোট উপগ্রহটির নাম দেওয়া হয় 'ডিমোস' এবং বড় উপগ্রহটির নাম দেওয়া হয় 'ফোবাস'। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, 'ডিমোস' ও 'ফোবাস' আবিষ্কারের দেড়শ বছর পূর্বে, সুইফট কী করে তাদের বর্ণনা দিলেন? তবে কি সুইফটই ডিমোস ও ফোবাসের প্রকৃত আবিষ্কারক? এটা ঠিক, উপরের উদ্ধৃত বর্ণনায় সুইফট 'দুটি নক্ষত্র' বা 'দুটি উপগ্রহ' কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, সুইফটের লেখা মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহ সম্পর্কিত বর্ণনাটিতে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু অসঙ্গতি বা পার্থক্য চোখে পড়ে:

সুইফটের ধারণা	আধুনিক ধারণা
• মঙ্গলগ্রহ হতে ফোবাসের দূরত্ব মঙ্গলগ্রহের ব্যাসের ৩ গুণ।	• মঙ্গলগ্রহ হতে ফোবাসের দূরত্ব মঙ্গলগ্রহের ব্যাসের ১.৪ গুণ।
• মঙ্গলগ্রহ হতে ডিমোসের দূরত্ব মঙ্গলগ্রহের ব্যাসের ৫ গুণ।	• মঙ্গলগ্রহ হতে ডিমোসের দূরত্ব মঙ্গলগ্রহের ব্যাসের ৩.৫ গুণ।
• মঙ্গলগ্রহকে আবর্তন করতে ফোবাসের সময় লাগে ১০ ঘন্টা	• মঙ্গলগ্রহকে আবর্তন করতে ফোবাসের সময় লাগে ৭ ঘন্টা ৩৬ মিনিট
• মঙ্গলগ্রহকে আবর্তন করতে ডিমোসের সময় লাগে ২১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।	• মঙ্গলগ্রহকে আবর্তন করতে ডিমোসের সময় লাগে ৩০ ঘন্টা ১৮ মিনিট।

সে যাই হোক না কেন, জোনাথন সুইফট মূলত হলেন একজন বিদ্রুপাত্মক গদ্য-রচয়িতা। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কখনো জ্যোতির্বিদ ছিলেন না। তা সত্ত্বেও, 'ডিমোস' ও 'ফোবাস' আবিষ্কারের দেড়শ বছর পূর্বে, মঙ্গলগ্রহের দুটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র বা উপগ্রহ আছে, এরূপ মহাকাশীয় তত্ত্ব ব্যক্ত করা সত্যিই বিস্ময়কর। অধিকন্তু, সুইফট কর্তৃক মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহদ্বয়ের কাক্ষিক সময় সম্পর্কে প্রকল্পিত ধারণা প্রদানের চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। সত্যি বলতে, তার এ ধরনের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস আমাদের সাহিত্যের জগতে একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

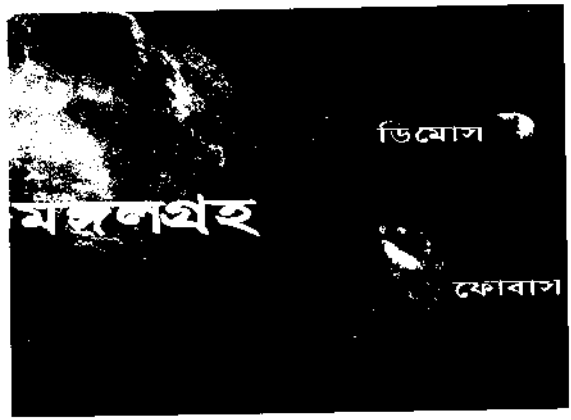

মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহ

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার আক্কাদীয় অঞ্চলে ইতিহাসখ্যাত রাজা ছিলেন নারাম-সিন, যার শাসনকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২২৫৪ থেকে ২২১৮ অব্দ। তিনি ছিলেন প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম বীরযোদ্ধা। সেই সময়ে, তিনি সাহসিকতা ও সামরিক কৌশলের সমন্বয় ঘটিয়ে আক্কাদীয় সাম্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তার সবচেয়ে বড় বিজয় অর্জিত হয়েছিল পারস্যের শক্তিশালী লাললুবি গোত্রের বিরুদ্ধে। ফলস্বরূপ, পরস্যের দারবারড়-ই-গাউর নামক অঞ্চলে একটি বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করা হয়, যা নারাম-সিনের বিজয়-স্তম্ভ নামে পরিচিত। বর্তমানে, এই স্তম্ভটি ফ্রান্সের লুভর জাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

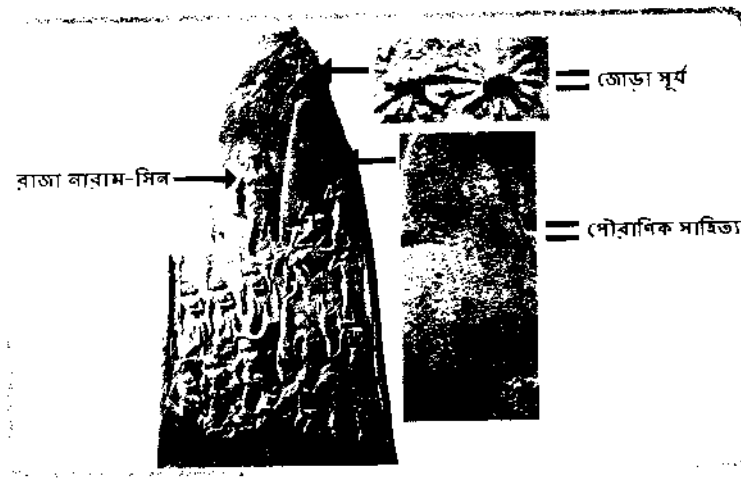

রাজা নারাম-সিনের ঐতিহাসিক বিজয়-স্তম্ভ

নারাম-সিনের এই বিজয়-স্তম্ভটি আসলে কিউনিফর্ম দ্বারা লিখিত ইতিহাস ও পুরাকথার মিশ্রণ। ফলে, এই লেখার বিষয়বস্তুটি অনেকের কাছে পৌরাণিক সাহিত্য হিসেবে গণ্য হয়। সে যাই হোক, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে, এই স্তম্ভেটিতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজা নারাম-সিন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠেছেন এবং ওনার এক হাতে ধনুক ও অন্য হাতে তীর। অধিকন্তু, শিরস্ত্রাণ পরা নারাম-সিনের শরীরটি অন্যদের চেয়ে বড় এবং ওনার সামনে পড়ে আছে দুশমনদের লাশ। অপরদিকে, স্তম্ভটির গায়ে লিখিত পৌরাণিক সাহিত্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নারাম-সিনের দেহে ধারণকৃত শিরস্ত্রাণ হল স্বর্গীয় প্রতীক। এছাড়াও, নারাম-সিনের মাথার উপরে আকাশ, যেখানে দুটি জ্যোতির্ময় সূর্য আলো ছড়াচ্ছে : যার পুরাকল্পীয় অর্থ হচ্ছে, নারাম-সিন শুধু পৃথিবীর শাসকই নয়, স্বর্গের শাসকও বটে। সবমিলিয়ে, রাজা নারাম-সিন নিজেকে মহাবিশ্বের রাজা বলে দাবি করেছেন।

খ্যাতিমান সুইস লেখক এরিক ফন দানিকেন ওনার জার্মান ভাষায় লেখা Meine Welt in Bildern গ্রন্থে, নারাম-সিনের স্তম্ভটির জোড়া সূর্য সম্পর্কে সবিস্ময়ে এভাবে প্রশ্ন তোলেন: "সবকালেই তো সূর্য ছিল একটি তাহলে, এই লোকগুলি (স্তম্ভটির গায়ে ক্ষোদিত) কীভাবে জোড়া সূর্যের দিকে চেয়ে আছে?"। পরবর্তিকালে, দানিকেনের এই প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়েছেন সালতানিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়া। কার্যত উনি মনে করেন, ওমর খৈয়াম ও সুইফটের বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যকর্মের মতই, এই জোড়া সূর্যকে সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, কিংবা গ্রহতত্ত্বের বিকল্পনা হিসেবে দুইভাবে ব্যাখা করা যেতে পারে।

আচারিয়ার প্রথম ব্যাখা অনুসারে, এই জোড়া সূর্য রূপকার্থকভাবে মঙ্গলগ্রহকে ইঙ্গিত করছে, যেখানে দুবার সূর্যোদয় ঘটে। অর্থাৎ, সৌরজগতের যে গ্রহে দুবার সূর্যোদয় ঘটে, তা হচ্ছে 'মঙ্গলগ্রহ'। অধিকন্তু, আচারিয়ার দ্বিতীয় ব্যাখা অনুসারে, এই জোড়া সূর্য হচ্ছে মহাকাশের সেই দুটি সূর্য, যাদের একমাত্র গ্রহ হচ্ছে 'Kepler-১৬b'। বস্তুত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা National Aeronautics and Space Administration (NASA) মহাকাশে একটি গ্রহের দুটি সূর্য আবিষ্কার করেছে, সেই গ্রহটির নাম হল 'Kepler-16b'।

জোড়া সূর্যের একমাত্র গ্রহ Kepler-16b

১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে, জার্মান জ্যোতির্বিদ জন এলার্ট বোড (১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ – ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দ) বহু পর্যবেক্ষণের পর মহাকাশের গ্রহগুলির দূরত্ব সম্পর্কে একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। সত্যি বলতে, এই সূত্রটি জোহ্যান ড্যানিয়েল টিটিয়াস (১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দ – ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) নামে অপর একজন জার্মান জ্যোতির্বিদ ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম উদ্ভাবন করেন। কিন্তু, এই সূত্রটি বোডের নামেই বেশি খ্যাতিলাভ করেছে। যদিও বর্তমান সময়ে, এটাকে 'টিটিয়াস-বোড সূত্র' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। তথাপি, এই সূত্রটি অনুসারে, 'n' হল শুক্র থেকে আরম্ভ করে গ্রহের ক্রমিক সংখ্যা। দূরত্বের একককে বলা হয় বোডের একক, যা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের এক-দশমাংশ। অতএব, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে 'একক' ধরে নিয়ে 'n' গ্রহের দূরত্ব (rn)-কে প্রমাণ করা যায় টিটিয়াস-বোড সূত্রটির সমীকরণের সাহায্যে। সমীকরণটি হল $r_n = a + b2n-1$। এখানে, 'a' ও 'b' হচ্ছে দুটি ধ্রুবক রাশি। অতএব, লগারিদম হিসেবে সমীকরণটি দাঁড়ায় $\log n (r_n-a) – \log b = n \log2$। ফলে এই সমীকরণ অনুযায়ী, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১ ধরে, আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব নিম্নে প্রদত্ত হল:

সৌরজগতের গ্রহগুলোর নাম	আধুনিক অনুসন্ধান অনুযায়ী প্রকৃত দূরত্ব	টিটিয়াস-বোড সূত্র অনুযায়ী দূরত্ব
বুধ	০.৩৯	০.৪
শুক্র	০.৭২	০.৭
পৃথিবী	১.০	১.০
মঙ্গল	১.৫২	১.৬
গ্রহাণুপুঞ্জ	২.৭৭	২.৮
বৃহস্পতি	৫.২	৫.২
শনি	৯.৫৫	১০.০
ইউরেনাস	১৯.২২	১৯.৬
নেপচুন	৩০.১১	৩৮.৮
প্লুটো	৩৯.৪৪	৭৭.২

পরবর্তিতে, টিটিয়াস-বোড সূত্রটিকে নির্ণায়ক ধরে জ্যোতির্বিদগণ মহাকাশে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করেন। কারণ, টিটিয়াস-বোড সূত্র অনুসারে, মহাকাশের ওই স্থানে একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহের অস্তিত্ব থাকার কথা। তবে অনুসন্ধানের ফলে যা দেখা গেছে, তা জ্যোতির্বিদদের মাথা আরও গুলিয়ে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, তারা দেখতে পান, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার বস্তুখণ্ড, যা গ্রহাণুপুঞ্জ নামে পরিচিত। ফলস্বরূপ, তারা ধারণা করেন, এই বস্তুখণ্ডগুলো হচ্ছে 'গ্রহ-এক্স' নামক বিস্ফোরিত ও লুপ্ত গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমান সময়ের অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, 'গ্রহ-এক্স'-এর বিস্ফোরণের ফলে

একটা বিরাট আকারের উল্কাপিণ্ড আমাদের এই পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে বিশাল আকারের ধুলো-মেঘের সৃষ্টি করে, যা সারা পৃথিবীকে এমনভাবে ঢেকে ফেলে যে সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। যার ফলে, তাপমাত্রার পরিবর্তনে গাছপালা ও প্রাণীকুল মারা যায়। এছাড়া উল্কাপাতে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই ফলস্বরূপ, আমাদের এই পৃথিবীর বুক থেকে ডাইনোসরদের অবলুপ্তি ঘটে।

প্রাচীন মায়া সভ্যতা সম্পর্কে কখনো শোনেনি, এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে। বস্তুত, এটা একটি মেসোআমেরিকান সভ্যতা। মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে তো বটেই, ল্যাটিন আমেরিকার মেরুদণ্ডে পল্লবিত এই সভ্যতার নানা নিদর্শন মিলেছে গুয়াতেমালা ও বেলিয ছাড়িয়ে হন্ডুরাস পর্যন্ত। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ অব্দ থেকে মোটামুটি ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালটা ছিল জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মায়ানদের অস্তিত্বশীল অধ্যায়। প্রাচীন মায়ার মানুষেরা কোটি কোটি বছরের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা পৌরাণিক সাহিত্যরূপে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। কার্যত, মায়ানদের একটি প্রাচীন লিখনফলক অনুযায়ী, 'গ্রহ-এক্স'-এর বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে মায়ানরা হয়ত অবগত ছিল, তার প্রমাণিক তথ্য পাওয়া যায় তাদের চিত্রিত লিখনফলকের নিদর্শন অনুসারে।

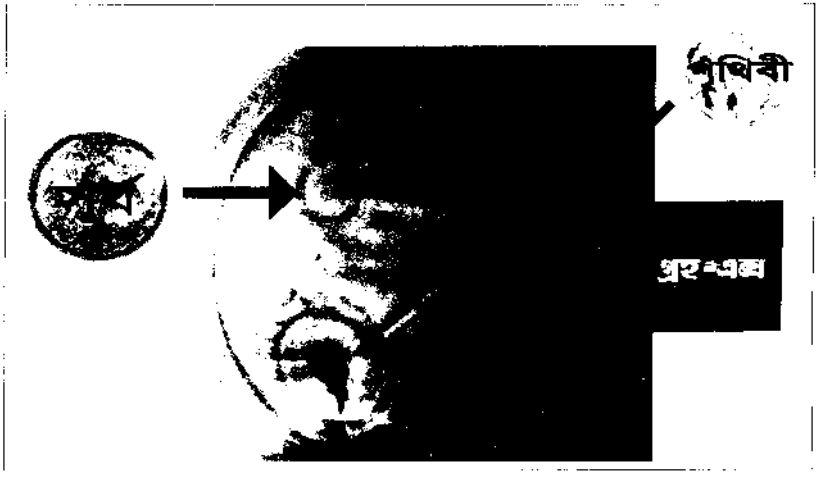

প্রাচীন মায়ানদের চিত্রলিপি সম্পর্কিত পৌরাণিক সাহিত্যে 'গ্রহ-এক্স'-এর অস্তিত্ব

উপরে প্রদর্শিত চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, 'গ্রহ-এক্স' বিস্ফোরিত হওয়ার কারণে একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড আমাদের এই পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে। এছাড়াও, চিত্রটিতে পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার দেখা যাচ্ছে। যা সত্যিই বিস্ময়কর। কেননা, প্রাচীন কালের অধিকাংশ মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী নামক আমাদের এই সুন্দর গ্রহটি সর্বদা সমতল। কিন্তু, প্রাচীন মায়ানরা অনেক আগে থেকেই জানত, আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটি আদৌ সমতল নয় বরং গোলাকার। তাদের পোপোল ভূহ্ নামক সৃষ্টিপুরাণে সেই কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। এই বিখ্যাত পুরাণটি লেখা হয়েছিল প্রাচীন মায়ানদের অন্যতম বিচরণস্থল গুয়াতেমালায়। অনেক বিশেষজ্ঞ এই পুরাণটিকে মায়ানদের বাইবেল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। যদিও, মায়ানরা এই পুরাণটিকে আদৌ দেবতার বাণী কিংবা পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে না। যাই হোক, আমাদের এই গোলাকার পৃথিবী সম্পর্কে পোপোল ভূহ্-এর তৃতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এরকম বলা আছে:

"... ওরা ছিল বুদ্ধিমান। ওরা তাকাল আর তৎক্ষণাৎ দূরে দেখতে পেল। ওরা অবলোকন করতে সক্ষম হল। ওরা সফল হল পৃথিবীর সকলকিছু জানতে। যখন ওরা দৃষ্টিপাত করল, তখনই ওরা সবকিছু দর্শন করল। অধিকন্তু, ওরা একে একে পর্যবেক্ষণ করল আকাশের খিলেন এবং পৃথিবীর গোলাকার মুখাবয়ব ...।"

ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, গ্রিক গণিতবিদ পিথাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০ – ৪৯৫ অব্দ) সর্বপ্রথম বলেছিলেন, আমাদের পৃথিবীটি গোলাকার। কেননা, তিনি মনে করতেন, গোলাকার পৃথিবীই হল সর্বোত্তম জ্যামিতিক আকার। কিন্তু, একটু আগে বলা হয়েছে যে, পোপোল ভূহ্ -এর পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারেও পৃথিবী গোলাকার। এখন প্রশ্ন হল, পিথাগোরাসের আগেই কি পোপোল ভূহ্ গোলাকার পৃথিবী সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিয়েছে? পূর্বেই বলা হয়েছে যে, খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ অব্দ থেকে মোটামুটি ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালটা ছিল জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মায়ানদের অস্তিত্বশীল অধ্যায়। অপরদিকে, পিথাগোরাসের জীবিতাবস্থার সময়কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০ থেকে ৪৯৫ অব্দ। প্রাচীন মায়ানদের পোপোল ভূহ্ নামক মূল্যবান সাহিত্যকর্মটি স্প্যানিশ বানানে এবং ল্যাটিন বর্ণমালায় অনুবাদ করা হয় ১৫৫৪ থেকে ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দের সময়টিতে। সত্যি বলতে, মায়ান চিত্রাক্ষর দ্বারা লেখা মূল পোপোল ভূহ্ আসলে যে কবে লেখা হয়েছে, সেই বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিতগণ স্পষ্ট কোনো ধারণা দিতে পারেননি। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, পোপোল ভূহ্ হয়ত পিথাগোরাসের পূর্বে গোলাকার পৃথিবী সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েরই পথ ভিন্ন। উভয়ই নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে মানুষের সামনে ধরা দেয়। তা সত্ত্বেও, সাহিত্য কখনো কখনো নানাবিধ জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনুপ্রেরণারূপে কাজ করে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সাহিত্যের সেই সকল গ্রহ অথবা গ্রহ সম্পর্কিত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে, যারা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি যে, পৃথিবীর অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ মহাকাশের গ্রহসমষ্টি ছাড়াও, নক্ষত্র, ছায়াপথ, কৃষ্ণবিবর, ইত্যাদি নিয়েও তাদের সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। যদিও, সেই সকল সাহিত্যকর্ম অধিকাংশই রূপকধর্মী, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক নয়। তারপরও সাহিত্যের ছায়ায় থেকে, এই প্রবন্ধটিতে আমি মহাকাশের গ্রহ সম্পর্কিত অত্যাবশ্যক তথ্যগুলো বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। যাতে করে সম্মানিত পাঠকগণ নতুনভাবে অনুধাবন করতে পারেন যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মাঝে সর্বদা একটি গভীর সেতুবন্ধন ছিল।

প্রবন্ধকার : স্নাতকোত্তর ইংরেজি বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

মেসিয়ের বস্তু : এম৩১

শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী

ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ধূমকেতু আবিষ্কারক চার্লস মেসিয়েরের কথা আমরা জানি। তাঁর চোখই ছিল দুরবিন যন্ত্রের মতো। সাধারণ একটি দুরবিন দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে তিনি যে তালিকা তৈরি করে গেছেন তা দেখে আজও আমরা বিস্মিত হই। বলা যেতে পারে, একরকম খালি চোখেই তিনি এ কাজটি করেছিলেন। সেই সময়ে এ তালিকাটি তৈরি করা এক অসাধারণ কৃতিত্ব। মূলত তিনি ধূমকেতু পর্যবেক্ষণে অসুবিধা দূর করার জন্যই দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে অত্যন্ত নিপুণতা ও শ্রম দিয়ে এ তালিকাটি তৈরি করেন। প্রথম দিকে নীহারিকা (নেবুলা), তারাস্তবক (স্টার ক্লাস্টার) ও ছায়াপথ (গ্যালাক্সি) মিলে মোট ১০৩টি বস্তু তালিকায় স্থান পায়। পরবর্তীকালে এতে স্থান পায় আরো ৭টি বস্তু। মেসিয়ের নিজেও প্রায় ডজনখানেক ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। তারপরও তাঁর তালিকাই তাঁকে বেশি বিখ্যাত করে রেখেছে। এ তালিকার প্রতিটি অন্তর্ভুক্তির আগে মেসিয়েরের নামানুসারে 'এম' (M) অক্ষরটি যুক্ত করা হয়। বর্তমানে এসব বস্তু আমাদের নিকট ' মেসিয়ের বস্তু' (মেসিয়ের অবজেক্ট) নামে সুপরিচিত।

BANSDOC Library Dhaka

মেসিয়ের বস্তু : এম৩১ (ধ্রুবমাতা ছায়াপথ)

আজকে আমরা এমনি একটি মেসিয়ের বস্তু এম৩১ এর সঙ্গে পরিচিত হব।

বস্তুটি খালি চোখেই মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নাহীন ধূলিমুক্ত হেমন্তকালের আকাশে অর্থাৎ-অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার পরে ধ্রুবমাতা মণ্ডলে (অ্যান্ড্রোমিডা) দেখা যায়। এর সাধারণ নাম 'ধ্রুবমাতা ছায়াপথ' (Andromeda Galaxy)। ছায়াপথটি মেসিয়ের তালিকার একত্রিশতম বস্তু যাকে 'মেসিয়ের ৩১' বা এম৩১ দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে। এম৩১ ছাড়াও বস্তুটি 'এনজিসি ২২৪' নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট সমধিক পরিচিত। এটি আমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী বিশাল একটি কুণ্ডলিত ছায়াপথ (স্পাইরাল গ্যালাক্সি)।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে অ্যান্ড্রোমিডা মণ্ডল ও মীনরাশির কতকগুলো তারা নিয়ে এখানে বিরাট একটি মাছের কল্পনা করা হয়েছে। অ্যান্ড্রোমিডার পায়ের তারাটির (γ - অ্যান্ড্রোমিডি) বাংলা নাম সুনীতি। সুনীতি হলেন ধ্রুবের মা। তাই এ মণ্ডলের বাংলা নামকরণ করা হয়েছে ধ্রুবমাতা। মণ্ডলটির নামানুসারেই বস্তুটির নামকরণ করা হয়েছে 'ধ্রুবমাতা ছায়াপথ'।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর পারস্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবদুর রহমান আল-সুফী সর্বপ্রথম বস্তুটি দেখেছেন বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বস্তুটিকে 'ছোট একটুকরো মেঘ' বলে তাঁর গ্রন্থেই উল্লেখ করেন। এরপর ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সাইমন মেরিয়াস এটি পর্যবেক্ষণ করেন। মেরিয়াস ছিলেন গ্যালিলিওর সমসাময়িক একজন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি গ্যালিলিওকে তাঁর দুরবিন দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণে সাহায্য করেন। এদিকে আবার ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিয়োভান্নি বাতিস্তা অদিয়ের্না ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই স্বতন্ত্রভাবে বস্তুটি আবিষ্কার করেন। এডমন্ড হ্যালিও গুরুত্ব সহকারে বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করেন। পরবর্তীতে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস মেসিয়ের বস্তুটিকে তাঁর তালিকায় স্থান দেন। মেসিয়ের তালিকায় বস্তুটির ক্রমিক সংখ্যা ৩১।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্সেল বলেন, বস্তুটি প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য তারা সমষ্টি মাত্র। কিন্তু দুরবিন দিয়ে তারাসমূহকে পৃথকভাবে দেখতে পাননি তিনি। তাই বস্তুটি কি তারা সমষ্টি, না গ্যাসীয় প্রকৃতির, এর অবস্থান কি আমাদের ছায়াপথের ভেতরে না বাইরে, এ নিয়ে দীর্ঘদিন চলতে থাকে বিতর্ক।

অবশেষে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে উইলসন পর্বত মানমন্দিরের ১০০ ইঞ্চি দুরবিন ব্যবহার করে আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল বস্তুটির স্বরূপ উন্মোচন করেন। বর্তমানে আমরা জানি, বস্তুটি বিরাট একটি কুণ্ডলিত ছায়াপথ। এটি আমাদের ছায়াপথের নিকটতম প্রতিবেশী। ছায়াপথ হলো হাজার হাজার কোটি তারার সমন্বয়ে গঠিত এক একটি তারকাজগৎ। যাকে দ্বীপ-বিশ্ব (Island of Universe) বলা হয়। এ রকম অসংখ্য ছায়াপথ মহাকাশে ছড়িয়ে আছে।

বস্তুটির বিষুবাংশ ০০ ঘন্টা ৪২ মিনিট ৪৪.৩ সেকেন্ড এবং বিষুবলম্ব +৪১ ডিগ্রি ১৬ মিনিট ৯ সেকেন্ড। দূরত্ব: ২,৪৩০-২,৬৫০ কিলো আলোক বর্ষ। আপাত প্রভা: ৩.৪৪। এতে রয়েছে প্রায় এক লক্ষ কোটি তারা।

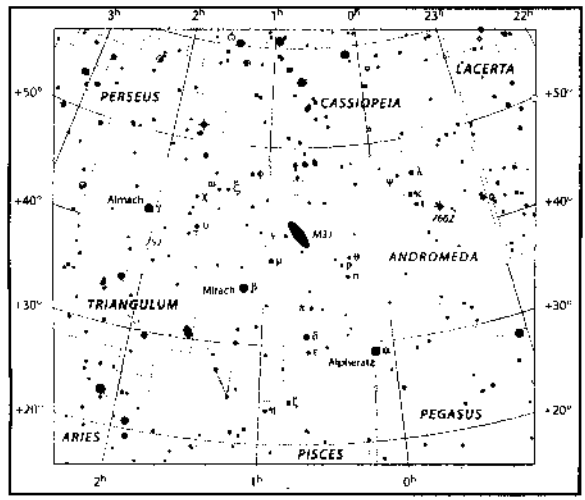

ধ্রুবমাতা মণ্ডল ও এর অন্তর্গত এম৩১ এর অবস্থান

ধ্রুবমাতা মণ্ডল (অ্যান্ড্রোমিডা) রাতের আকাশের পরিচিত একটি তারামণ্ডল। এটি উত্তরাকাশে দেখা যায়। এম৩১ এর রয়েছে দুটি উপছায়াপথ, যা মেসিয়ের তালিকায় এম৩২ ও এম১১০ দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলো আবার এক একটি উপবৃত্তাকার ছায়াপথ।

প্রবন্ধকার : জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জলবায়ু পরিবর্তনে ছাদ কৃষির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা

ড. মোঃ শরফ উদ্দিন

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। নদীমাতৃক এই দেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি এবং আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি, রোগ ও পোকামাকড়ের সুষ্ঠ দমন ব্যবস্থাপনার জন্যেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাচ্ছে। জলবায়ুগত এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের যে সমস্ত দেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ুগত পরিবর্তনের প্রভাব ইদানিং বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এতটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরে সোরে উচ্চারিত হচ্ছে। যে সকল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দূর্যোগ সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে প্রতীয়মান হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভয়াবহ মৌসুমী বন্যা ও উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বৃদ্ধি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কৃষি ক্ষেত্রের উপর পড়ছে অর্থাৎ ঋতুভিত্তিক ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কৃষি ব্যবস্থা ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে জলবায়ুগত বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন জলবায়ুগত সমস্যার কারণে ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিবর্তন কৃষি উৎপাদন থেকে শুরু করে জনজীবন পর্যন্ত সবকিছুতে একটা বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে। এ দেশের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। আর এই কৃষিই হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান শিকার। ফলে কৃষির উৎপাদন ক্রমাগতভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বৈরী জলবায়ুর প্রভাবে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের কৃষি। অধিক তাপমাত্রা, অধিক ঠান্ডা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কালবৈশাখী, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা, ভূমিধস, বন্যার পরিমান ও তীব্রতা বৃদ্ধি, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় এলাকায় লবণের পরিমান বৃদ্ধি ও নদী তীরবর্তী এলাকায় ভূমিক্ষয় ইত্যাদি কারণে প্রতি বছর ক্ষতির মুখে পড়তে হয় আমাদের চাষীদের। প্রকৃতপক্ষে এগুলো থেকে পরিত্রানের তেমন কোন সুযোগ নেই। পরিবেশবিদরা চাচ্ছেন পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে হোক নগরায়ন। কিন্তু শহরে গাছ লাগানোর জায়গাটি এক সময় রাখা হলেও বর্তমানে নেই বা স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে রাস্তার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবাসিক ভবনগুলো নির্মান করা হচ্ছে ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রধান্য দিয়ে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আবাসিক ভবন নির্মানের সময় পরিবেশ ও শ্রান্তিবিনোদনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেই সুযোগটি কোথায়? পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে চোখ মেললে শুধুই দেখা যাবে বহুতল ভবন। সবুজের কোন চিহ্ন দেখা যাবে না। ফলে ঐ সব দেশে বড় হওয়া শিশুরা প্রথম থেকেই দৃষ্টি সমস্যাই ভোগেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে চশমার ব্যবহার করতে হয়। আমরা যদি মেগা সিটি ঢাকা, চট্টগ্রামের কথা ভাবি তাহলে এমনটিই হতে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে এই অবস্থা পরিবর্তনের তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে কৃষিবিদগন দেখছেন নতুন সম্ভাবনা। সেটি হলো ছাদ বাগান। প্রত্যেকটি ভবনে রয়েছে একটি ছাদ। বাড়ির মালিক ইচ্ছে করলে এই ছাদটি কৃষি কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। ইতিমধ্যেই কয়েকজন সফলতা পেয়েছেন ছাদ কৃষিতে। মিরপুর-২ এর বাসিন্দা মি. মামুন জানালেন প্রতি বছর ছাদ চারা

বিক্রি করেন এক থেকে দেড় লক্ষ টাকায়। এখান থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, ছাদ বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখছে। কৌতুহলবশত: বৃক্ষপ্রেমিক মামুনুর রশীদকে তার অনুভুতির কথা জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন প্রতিদিন একবার বাড়ির ছাদে না উঠলে ভালো লাগে না। খেয়াল করে দেখবেন, গাছও কথা বলে। বাড়ির মালিক গাছের দিকে দৃষ্টি দিলেই এই ভাবের আদান-প্রদান হয়। আমাদের দেশে মাথাপিছু জমির পরিমান অত্যন্ত কম। এছাড়াও প্রতিদিন কমছে চাষাবাদযোগ্য জমি। কিন্তু আমাদের প্রায় সকলের আছে একটি বাড়ি আর বাড়ির রয়েছে ছাদ এবং উঠানে রয়েছে সামান্য জায়গা। অনেক মানুষের বাড়ির সামনে অলসভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় কিছু জায়গা বছরের পর বছর, যেখানে অনায়াসে বসানো যাবে কয়েকটি টব, যেখানে পছন্দনীয় শাক-সবজি, ফল মুলের চাষ করা যাবে। কাঠের তৈরি বেড, বিভিন্ন ধরণের ড্রাম, কনক্রিটের তৈরি বেড এবং হাইড্রোফনিক্স স্থাপনায় জন্মানো যাবে। গাছের আকৃতি ও চাহিদানুযায়ী মাটি ও পুষ্টি উপাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ির ছাদে যারা ফল বাগান বা সবজি বাগান করে থাকেন তাদের একটি বিষয়ের উপর এ সময়ে বিশেষ নজর দিতে হবে তা হলো নিয়মিত পানির ব্যবস্থা করা এবং সম্ভব হলে দিনে একবার আপনার টবের গাছগুলো সাথে সাক্ষাৎ করা। পানি শুধু গাছের গোড়ায় না দিয়ে কিছু অংশ পাতায় ছিটিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। স্বল্প স্থায়ী শাক সবজিগুলো একের পর এক চাষ করা যাবে। কিন্তু বহুবর্ষজীবি গাছগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভালো ফলন দিবে। যেমন কনক্রিটের তৈরি টবে যে কোন জাতের আম ১০-১২ বছর এবং অন্যান্য ফল (কুল, পেয়ারা, আমড়া, কামরাঙ্গা, ডালিম, জামরুল, আতা, শরিফা, বিভিন্ন ধরনের লেবু, মাল্টা প্রভৃতি) ১৫-২০ বছর পর্যন্ত সফলভাবে জন্মানো সম্ভব। ফল বিজ্ঞানীরা সবসময়ই চেষ্টা করেন কিভাবে ফলের উৎপাদন বাড়ানো যায়, নিরাপদ ও বিষমুক্ত ফল ক্রেতাসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে, বছরের বেশিরভাগ সময় দেশীয় ফলের সরবরাহ থাকে। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, টবে অনায়াসেই পেয়ারা, আমড়া, লেবু, কামরাঙ্গা, জামরুল, ডালিম, বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি চাষাবাদ করা যায়। সুতরাং আপনার একটু প্রচেষ্টাই বাড়ির ছাদটি বাগানে পরিণত হতে পারে।

আম এদেশের মানুষের অতি পছন্দের একটি ফল। ছোট-বড় সব বয়সের মানুষের কাছে এটি পছন্দের একটি ফল। পুষ্টিমানের দিক থেকেও আম অন্য কোন ফলের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমে রয়েছে শ্বেতসার, চর্বি, আমিষ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য এবং ভিটামিন'স। আমের রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার। অন্যান্য যে কোন ফলের তুলনায় মানুষ এটি বেশী পরিমানে খেয়ে থাকে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন আম চাষাবাদের জন্য অনেক জমি দরকার, জমিটি হতে হবে সুনিষ্কাশিত, মাটি হতে হবে দোঁআশ বা বেলে

দোঁআশ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হলো, পছন্দের এই ফলটি চাষ করবেন কিভাবে? প্রায় দেখা যায় অনেক ক্রেতা বারি আম-৩ তথা আম্রপালি জাতটি ছোট টবে লাগিয়ে রাখেন যেখানে ১৫-২০ কেজি পরিমাণ মাটি ও জৈব পদার্থ ও মাটির মিক্সার থাকে। কিন্তু কয়েক বছর পর আর সেই গাছ থেকে কাঙ্খিত ফলন পান না অথবা গাছটি বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। আর আমের মধ্যে বারি আম-৩ বা আম্রপালি জাতটি অনেকে চাষ করে থাকেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু বারি আম-৩ (আম্রপালি) জাতটিই নয়, পছন্দের অন্য জাতগুলিও চাষ করা যাবে এই বিশেষ ধরণের টবে। বর্তমানে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বাড়ির ছাদে ফল সবজি বাগান বেশ ভালো ভাবেই গড়ে উঠেছে। এটি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। ছাদের কোন জায়গায় টবটি স্থাপন করবেন এর জন্য সেই রকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ছাদের যে জায়গায় স্থাপন করলে কোন অসুবিধা হবে না সেই সমস্ত জায়গা নির্বাচন করতে হবে। এই টবটি যে কোন জায়গায় স্থাপন করা যাবে। যদি জায়গাটি নিচু, অনুর্বর, অনাবাদি এবং উলু বা কাশ দ্বারা আবৃত থাকে সেস্থানেও এই পদ্ধতিতে আম চাষ করা যাবে। তবে বাড়ির ছাদে স্থাপনের জন্য টবের ওজনের বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। টবের বাইরে বেলে মাটি না এটেল মাটি, পানির স্তর উপরে বা নিচে, আগাছায় ভরা সেটি মুখ্য বিষয় নয়। টবের গাছে জন্মানো ফলগুলি একটু কষ্টের তাই রোগ ও পোকা, কবুতর, পাখি যেন ফলগুলি খেতে বা নষ্ট করতে না পারে সেজন্য সময়মত ফ্রুট ব্যাগিং অথবা নেটের ব্যবস্থা করা উচিৎ। তবে টবে আম চাষ করার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে জাতগুলো যে এলাকায় ভালো ফলন দেয় সেগুলো নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন পদ্ধতি

বিশেষ ধরণের এই টবটি তৈরির জন্য খুয়া (ইটের টুকরা), সিমেন্ট, বালি ও চিকন রডের প্রয়োজন হয়। টবের আকার ৩২ x ৩২ x ৩০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ইচ্চতা) এবং টবের ভিতরের আকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২৫ ইঞ্চি। টবের উপরের প্রান্তে ৪ ইঞ্চি পাড় বা কিনারা করলে দেখতে সুন্দর হয়। টবটি ভালোভাবে স্থানান্তরের জন্য চার প্রান্তে ৪টি হুক রাখতে হবে। টবটির নিচের প্রান্তে ৪টি পানি নিষ্কাষনের জন্য ছিদ্র রাখতে হবে। টবটি ভরাট করার সময় নিচের অংশে (২ ইঞ্চি পুরুত্ব) ছোট ইটের টুকরা ব্যবহার করতে হবে।

এরপর ৫০ ভাগ দোঁআশ মাটি এবং ৫০ ভাগ পচানো গোবর সার অথবা জৈব সার ব্যবহার করতে হবে এরপর পছন্দনীয় আমের জাতের কলম সংগ্রহ করে লাগাতে হবে। তবে গুটি আমের গাছ লাগিয়ে সেটিকে পছন্দের সায়ন দ্বারা কলম করা যায়। টবে জন্মানোর জন্য নিচের দিকে বা মাটির কাছাকাছি গ্রাফটিং করা চারাগুলি নির্বাচন করতে হবে। মাটির উপর থেকে ৫-৮ ইঞ্চি দুরুত্বে কলম করলে সবচেয়ে ভালো হবে। প্রাথমিক অবস্থায় সব টবগুলো পাশাপাশি রাখলেই চলবে। এক-দুই বছর পর নির্দিষ্ট জায়গায় স্থানান্তর করতে হবে। তবে কলামের উপরে স্থায়ীভাবে এই ধরণের টব-তৈরি করা যাবে। প্রতি বছর গাছের চাহিদা অনুযায়ী সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। রাসায়নিক সারের চেয়ে জৈব সার বেশি কার্যকরী। তবে

সকল ধরণের খাদ্যোপাদান নিশ্চিত করতে হবে। গোবর সার বা জৈব সার বা কেঁচো সার, ডিএপি, এমপি, জিপসাম, দস্তা সার এবং বোরিক পাউডার। সবগুলো সার একবারে প্রয়োগ না করে দুই থেকে তিনবারে প্রয়োগ করা ভালো। সার প্রয়োগের পর পানির ব্যবস্থা করতে হবে। যখন বৃষ্টিপাত কম হয় এবং মাটি শুষ্ক অবস্থায় থাকে তখন প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সরবরাহ করতে হবে। গাছ লাগানোর প্রথম দুই বছর গাছে শক্ত খুটির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কেউ ৩/৪টি আমের জাত পছন্দ করেন কিন্তু তার মাত্র একটি টব রাখার মতো জায়গা আছে তাহলে দ্বিতীয় বছরে প্রত্যেকটি ডালে কাঙ্খিত জাতের সায়ন দ্বারা টপ ওর্য়াকিং করতে হবে। এই পদ্ধতিতে একটি গাছে অনেকগুলো জাতের সমাবেশ ঘটানো যায়। টবে জন্মানো গাছের ফলন বাগানে জন্মানো গাছের ফলনের চেয়ে কিছুটা কম তবে সন্তোষজনক। প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্গমন, বাড়ছে তাপমাত্রা, উষ্ণ হচ্ছে পৃথিবী। এমতাবস্থায়, বাড়ির ছাদে বিভিন্ন ফল ও সবজির সমাগম হলে বাড়িতে বসবাস অনেকটাই আরামদায়ক হতে পারে। প্রতিবেশিরা ফল খেতে না পারলেও পরিবেশের শীতলতা অনুভব করতে পারবেন অতি সহজেই। আমগাছ আমাদের জাতীয় বৃক্ষ এবং আম সর্বাধিক পছন্দনীয় একটি ফল। সুতরাং আমের চাহিদা পুরণে শুধু বাগানের দিকে চেয়ে থাকার প্রয়োজন নেই, টবে জন্মানো আম গাছই আপনার পরিবারের আমের চাহিদা পূরণ করবে এটাই আমাদের আশাবাদ।

প্রবন্ধকার : উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাপাইনবাবগঞ্জ।

জীবনের প্রয়োজনীয়তায় প্রযুক্তি

প্রকৌশলী মোঃ টিপু সুলতান

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতা। সাম্প্রতিক বিশ্বে আবিষ্কার জগতে বিস্ফোরণের কারণে জগতে মহাজাগরণের মহোৎসব চলছে। আর এর ছাপ সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, আবিষ্কার ও চিন্তার জগতে ঢেউ লেগেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সহায়ক। সে কারণে কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী সকলের মাঝেই কমবেশি বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে ইতিহাসকে রক্ষা করে। কাউকে রক্ষা করে অন্ধ আবেগ থেকে, দার্শনিককে বাঁচায় মতান্ধতার হাত থেকে, সমাজবিজ্ঞানীকে দেয় সামগ্রিক বিচারবোধ ক্ষমতা। বিজ্ঞান প্রযুক্তি মানুষের সামনে আসছে শক্তিশালী দানবের মতো। বিজ্ঞান আজ ব্যবহৃত হচ্ছে যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, অফিস, বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদ, বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ, সংস্কৃতির বিনিময় প্রভৃতি কাজে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে বিশ্বসমাজ আজ Global Family-তে পরিণত হয়েছে। You tube, google, Facebook, My space, এবং Twitter প্রভৃতি সুবিধার মাধ্যমে বিশ্ব সমাজ আজ হাতের মুঠোয় চলে আসছে। ওয়েব বেইজড (Web based) ইনফরমেশন পদ্ধতিতে অডিও/ভিডিও কনফারেন্সিং করা যায়। রিজার্ভেশন সিস্টেমে এমনকি ইলেকট্রনিক ফাণ্ড ট্রান্সফার পদ্ধতিতে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় দূরশিক্ষণ, অনলাইনে শিক্ষা-সুশিক্ষা এবং গবেষণায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান বিপ্লব এনেছে। রোগীর বিভিন্ন প্রকার টেস্ট ও রোগ শনাক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞান। ই-হেলথ, এম হেলথ, টেলি হেলথ, টেলি ডার্মাটোলজি, টেলি প্যাথলজি, টেলি ফার্মেসী ইত্যাদি। চিকিৎসকদের মধ্যে টেলিকনফারেন্সিং বা ভিডিওকনফারেন্সিং-এর সাহায্যে হাইরেজুলেশন ছবি, অডিও ফাইল, রিয়েল সাইজ ভিডিও, রোগীর রেকর্ড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসদের কাছে পাঠিয়ে পরামর্শ নেওয়া সহজ হয়ে গেছে।

ই-গভর্নমেন্টের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন নীতি যেমন পরিবেশনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, বাণিজ্যনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রভৃতি জনগণকে অবহিতকরণ ও জনগণকে অধিকতর সমৃদ্ধকরণ এবং দুর্যোগ ও যোগাযোগ-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-টিকিটিং এমনকি ই-সিগারেট এর নাম অধুনা উচ্চারিত হচ্ছে। অনলাইনে কোনো পণ্য পছন্দ করার পর অর্ডার দিলে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান পণ্যটি বাসায় পৌঁছে দেয়। দাম দেওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো অপশন থাকে; বিক্রেতা ক্রেডিট কার্ডে বা ক্রস চেকে কিংবা নগদ টাকাতেও পেমেন্ট করার সুযোগ পান। ভাল একটি ওয়েবপেইজ তৈরির জন্য গ্রাফিক্স এর পাশাপাশি কিছু অ্যানিমেশন সফটওয়্যার ওয়েব প্রোগ্রামিং-এর প্রয়োজন হয়। এখন অনলাইন পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশের খবর পাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের পাশাপাশি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিনোদনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে। ক্রিকেট, ফুটবল ও অলিম্পিকের মতো অনুষ্ঠান জীবন্ত পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। ডিজিটাল ফরমেটে ছবি তৈরি হচ্ছে। অনেক ছবি প্রিমিয়াম হচ্ছে ক্যাবল টিভিতে।

সাম্প্রতিক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে। যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-ভাবনার অথবা বুদ্ধিমত্তার বাস্তবায়ন করাটাই হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এক্সপার্ট সিস্টেম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি স্তর। জেট প্লেন চালনা, রোগ নির্ণয়, কোনো ডিভাইসের ত্রুটি সংশোধন, যুদ্ধ কৌশল নির্ণয়, খনি গবেষণা ও তৈরি, অনুসন্ধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক্সপার্ট সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিজ্ঞানের কৃত্রিম মানুষ তথা রোবট আবিষ্কার বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর ঘটনা। মানুষের মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে রোবট। রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে খনি গবেষণায়, সমুদ্রের তলদেশে, মহাকাশ গবেষণায়, গ্রহে, শিক্ষা, কলকারখানার মত প্রতিকূল পরিবেশে। মানুষের যেখানে কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রায়োসার্জারি এবং ক্রায়োথেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় যেখানে বরফশীতল তাপমাত্রায় কোষগুলোকে ধ্বংস করার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অস্বাভাবিক কোষকে ধ্বংস করে। বর্তমানে ত্বকের বিভিন্ন অসুস্থতা যেমন আচিল, মেছতা, তিল মেছতা এবং ত্বকের ক্যান্সার চিকিৎসায় এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কেবল ত্বক নয় যকৃৎ, পাইলস, মুখের ক্যান্সার, চোখের ক্যান্সার, হাড়ের ব্যথা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রোয়োসার্জারি ও ক্রায়োথেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মহাকাশ গবেষণায় যুগান্তর সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তারার আলো ভূপৃষ্ঠে পড়া, মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, পৃথিবীর ব্ল্যাকহোল, তারকারাজি, নীহারিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। মহাকাশযানের গতিপথ নির্ধারণ, জ্বালানি, তাপমাত্রা, দিকনির্দেশনা ও সিগনাল প্রেরণে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কম্পিউটার ব্যবহার করে নিখুঁত মাপের পার্টস তৈরি, যেমন কম্পিউটারের পার্টস, গাড়ির পার্টস, প্রভৃতি। পছন্দ অনুযায়ী রং তৈরি এবং বিভিন্ন কোম্পানির গাড়ির ত্রুটি নির্ণয়ে আজ কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত চালকবিহীন মিসাইল প্রতিপক্ষের রাডারকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যস্থলে আঘাত করতে পারে।

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রাডার দিয়ে শত্রু বিমানের আগমনী বার্তা, অবস্থান এবং গতি শনাক্ত করা ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ধ্বংস করা সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক যুদ্ধ বিমানগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে চালকবিহীনভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে পারে। প্রচলিত নিউক্লিয়ার মিসাইলের বদলে স্বনিয়ন্ত্রিত ন্যানো মিসাইল তৈরি হবে, যা কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যেই লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে পারবে। প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। বায়োম্যাট্রিক্স পদ্ধতি আঙুলের ছাপের সাহায্যে ব্যবহৃত হয়। অস্ট্রেলিয়াতে স্মার্ট সিস্টেম এবং ই-পাসপোর্ট সিস্টেমে বায়োম্যাট্রিক্স প্রাইভেসি কোড-এর ব্যবহার হয়। ব্রাজিলে আঙুলের ছাপভিত্তিক পরিচয়পত্র ব্যবহার করে। তাদের ই-পাসপোর্টে স্বাক্ষর ছবি এবং দশ আঙুলের ছাপও বায়োম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকে। আমাদের দেশে ভোটার আইডি কার্ডে বায়োম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা হয়েছে, বর্তমান ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্টেও বায়োম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা হচ্ছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি কৃষি, বায়োটেকনোলজি, ঔষধ তৈরি, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে ফুলারিনের তাপ প্রতিরোধী এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় ন্যানোপ্রযুক্তিতে এর ব্যবহার হয়। ন্যানোরোবট মানবদেহের ভেতর অস্ত্রোপচার করতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। ক্যান্সার কোষ ধ্বংসে ন্যানো সুচ ব্যবহার হবে, যা আমাদের মাথার চুলের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ হবে। ন্যানো প্রযুক্তি দিয়ে মানুষের কৃত্রিম অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ তৈরি করার গবেষণা চলছে। ন্যানো প্রযুক্তি দিয়ে গাড়ি তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে। আধুনিক কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পিউটার অপরাধ সংঘটিত হয়। যেমন- সফটওয়্যার পাইরেসি, কম্পিউরাইট লঙ্ঘন, হার্ডওয়্যার চুরি, ডেটা

চুরি, প্লেজিয়ারিজম প্রভৃতি। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবে সমাজ জীবনে কিছু কুফলও সংঘটিত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশৃঙ্খল সংস্কৃতি ও ভায়োলেন্সপূর্ণ গেম তরুণ-তরুণীদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে এমন কিছু অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ সাইট রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটতে পারে। হ্যাকারের আক্রমণে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি চুরি হয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া, পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার চুরি হওয়ার মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা আর থাকছে না। বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন- কোমর, হাত, কব্জিতে ব্যথা, হৃৎপিন্ড, কান ও মস্তিষ্কের রোগ ও মানসিক জটিল রোগ দেখা দিচ্ছে। বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিগ্রস্থতা, ডিজিটাল ডিভাইড এমনকি মিথ্যা প্রচারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ব্লগ সাইটে কারও ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, সংবাদ এডিট করে মিথ্যা ছবি বা তথ্য প্রকাশ করে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন বা মানহানি করা হচ্ছে। এসব কাজের মাধ্যমে ভয়াবহ দাঙ্গা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্বের হুমকি, রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির কুফল এবং কম্পিউটার অপরাধের কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার নীতির প্রশ্ন উঠছে। নীতিবিজ্ঞান একটি দার্শনিক চিন্তা যা বর্তমান দর্শনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানুষ ও সমাজের ক্ষতি হোক এটা কোনো মতাদর্শের মানে হতে পারে না। সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন এবং চিন্তা-চেতনার সংকীর্ণতা আমাদের সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। পৃথিবীতে যেসব প্রচলিত ধর্ম এবং মতাদর্শ আছে তার ভেতর সত্য তত্ত্বও মানব সমাজ এবং সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শ ও ধর্ম পালন এক্ষেত্রে ফলদায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সাময়িক মুক্তির সম্ভাবনা থাকলেও বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর স্বার্থে সফল হওয়া এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শ আমাদের সকল প্রকার অশান্তি ও জটিলতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে সকল প্রকার অশান্তি থেকে মুক্তি পাক মানব সমাজ এই কামনা করছি আন্তরিক ভাবে।

প্রবন্ধকার : বিভাগীয় প্রধান, চুয়াডাঙ্গা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চুয়াডাঙ্গা।

যেভাবে এল আমাদের প্রচলিত বর্ষপঞ্জিগুলো

হোসনে আরা পারভীন

মানব সভ্যতার এক অপরিহার্য উপাদান হলো 'বর্ষপঞ্জি' অথবা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ক্যালেন্ডার'। 'ক্যালেন্ডার' শব্দটি ল্যাটিন, যার অর্থ হচ্ছে 'হিসাব বই'। আবার সমার্থক ইংরেজি শব্দ 'এ্যালমানাক' যা আরবি ভাষা থেকে এসেছে বলে অনুমান করা হয়, যার বাংলা অর্থ বোঝায় পঞ্জিকা। প্রাচীন হিন্দু পঞ্জিকাকে বলা হতো 'পঞ্চাঙ্গ' অর্থাৎ পঞ্চ অঙ্গ বিশিষ্ট। কারণ-এতে পাঁচটি বিষয়ে আলোকপাত করা হতো। এটাতে দিন, ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র, পূজা-পার্বন, উৎসবের দিন, জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসের বর্ণনা সম্বলিত তথ্যবহুল বার্ষিক বিবরণী বিদ্যমান। তাই সাধারনভাবে বলা যায়,বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার হলো দিন, সপ্তাহ, মাসে বিভক্ত একটি বৎসর ভিত্তিক সারণি। যার মধ্যে জাতীয় দিবস, ছুটির দিন, প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের দিন উল্লিখিত হয়। 'ক্যালেন্ডার', 'বর্ষপঞ্জি' বা 'এ্যালমানাক' যাই বলা হোক না কেন এর জন্মস্থান প্রাচীন মিশরে। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন পঞ্জিকা মিসরে প্রস্তুত হয়েছিল বলে একে মিশরীয় সভ্যতার অবদান বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

আদিম মানুষকে প্রতিনিয়ত হিংস্র পশু আর বিরুদ্ধ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। তাই দৈনন্দিন জীবনে সুখ-সাচ্ছন্দের জন্য মানুষ প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধান করতো। তারা বুঝতে পেরেছিল-দিনের পর রাত হয় আবার দিন আসে এটা সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রকৃতিতে কখনো গরম পড়ে, মাটি ফেটে চৌচির হয়, শুরু হয় বৃষ্টির জন্য হাহাকার, প্রচন্ড দাবদাহে জনজীবন বিপর্যস্ত। আবার কিছুদিন পর শুরু হয় বৃষ্টি, চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, পুষ্প-পল্লবে ভরে উঠে প্রকৃতি। কখনো কখনো অতি বর্ষণে বন্যার জন্য দুর্ভোগ নেমে আসে। এই প্রকৃতিতেই আবার দেখা দেয় শৈত্যপ্রবাহ। শীতের করাল গ্রাসে পরিবেশে সৃষ্টি হয় জড়তা, স্থবিরতা, রিক্ততা। প্রকৃতির এই পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি মানুষ লক্ষ্য করলো এবং এটাও বুঝতে পারলো– দিবা-রাত্রি পরিবর্তনের পর ঋতুর পরিবর্তনও জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে তারা ঋতুর সঙ্গে দিনের সম্পর্ক নির্ণয়ে তৎপর হয়ে উঠে। ঠিক কতদিন পর গরম কাল আসবে বা শীতের আগমন ঘটবে বাস্তবিক কারণে তা জানা মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠে। আর এভাবেই বছর, মাস, সপ্তাহ ও দিনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যই মানুষ পঞ্জিকা প্রণয়ন করে। একটি সর্বজনগ্রাহ্য বর্ষপঞ্জি তৈরীর সমস্যা সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে আর এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা থেকেই পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বিজ্ঞান চর্চা, বিশেষ করে জ্যোতি-র্বিজ্ঞান চর্চার শুরু।

সন এবং তারিখ শব্দ দুটি আরবী থেকে এসেছে, আর সাল এসেছে ফারসি থেকে। ইসলাম ধর্মে সৌর ও চন্দ্র উভয় শ্রেণীর বর্ষ গণনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে: ''সূর্য ও চন্দ্র গণনা করতে নিয়োজিত রয়েছে এরা নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে।''[১] ''আমি রাত ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন, রাতের নিদর্শনকে আলোহীন করেছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা তোমাদের রব এর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পারো এবং সবকিছু বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছি।''

পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় ২৪ ঘন্টা যাকে একদিন বলা হয়। আর সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে, যাকে বলা হয় এক বছর। এই দুটো হিসাবকে মৌলিক বলা হয় কারণ এই দুই হিসাবের উপর মানুষের কোন হাত নেই কিন্তু এর মাঝামাঝি সময় যে সপ্তাহ আর মাস সেগুলো মানুষের খেয়ালখুশি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে। যেকোন বর্ষপঞ্জি প্রণয়নের মূল ভিত্তি হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ আজ বর্ষপঞ্জির যে হিসাব অনুসরণ করেন তার ভিত স্থাপিত হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাবিলন সভ্যতার সময়। তখন মাসের হিসাব করা হতো চাঁদের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দেখে। একটি অমাবস্যার পর পূর্ণিমা হতে চৌদ্দটি সূর্যোদয়ের সময়কে ২৪ ঘন্টায় বিভক্ত করে এর নাম দেওয়া হয় দিন। সেকালে আকাশে পৃথিবীর কাছাকাছি পাঁচটি গ্রহ তাদের চোখে পড়েছিল, তার সাথে সূর্য এবং চন্দ্রকেও গ্রহ বলে মনে করা হয়েছিল। এই সাতটি গ্রহের নামানুসারে এক একটি দিনের নামকরণ করা হয়েছিল- শনি, রবি (সূর্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র। এভাবে সাতের চক্রে সাতটি দিনকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে নাম দেয়া হয়েছিল সপ্তাহ। সাত দিনের আরেকটি তাৎপর্য এই যে, পবিত্র কোরান শরীফের সূরা হূদের ৭নং আয়াতে বর্ণিত আছে:

"আর তিনিই সর্বশক্তিমান, যিনি সৃজন করিয়াছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিবসে।" এমন কথা পবিত্র বাইবেলেও পাওয়া যায়। সেখানে রয়েছে ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ৬দিনে এবং ৭ম দিনে বিশ্রাম গ্রহন করেন। এই ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেয়ার জন্যই সপ্ত অহের সমাহার ঘটানো হয় তাছাড়া দুই সপ্তাহ হলে মোটামুটি চন্দ্রকলার একটি পক্ষের (শুক্ল পক্ষ বা কৃষ্ণ পক্ষ) সমান। তাই সাত দিনে সপ্তাহ ধরাটা হিসাবের জন্য বেশ সুবিধাজনক। সূর্য তার অক্ষে ঘুরতে ঘুরতে একসময় উত্তর দিকে চলে যায়, একে বলে উত্তরায়ণ। এটি হয় ২১জুন। বর্তমান ক্যালেন্ডারে উত্তর গোলার্ধে বছরের সবচেয়ে বড় দিন এই ২১ জুন। আবার ২২ডিসেম্বর সে চলে আসে দক্ষিণ দিকে, একে বলা হয় দক্ষিণায়ন। সেই কারণে উত্তর গোলার্ধে বছরের সবচেয়ে ছোট দিন ২২ডিসেম্বর। সূর্য উত্তরায়ণে যেতে ২১ মার্চ একবার বিষুবরেখা অতিক্রম করে, এই সময়কে বলা হয় বসন্ত বিষুবন। আবার দক্ষিণায়নে যেতে ২৩ সেপ্টেম্বর বিষুব রেখা অতিক্রম করে, একে বলে শরৎ বিষুবন। সূর্য এই দুই দিন ঠিক পূর্বে ওঠে আর অস্ত যায় ঠিক পশ্চিমে; তাই সারা পৃথিবীতে এই দুই দিন, দিন-রাত সমান হয়। উত্তরায়ণ থেকে শরৎ বিষুবন পর্যন্ত সময়কে অর্থাৎ ২২ জুন থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কে গ্রীষ্মকাল, তারপর ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শরৎকাল, ২২ ডিসেম্বর থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত সময়কে শীতকাল এবং ২১ মার্চ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত সময়কে বসন্তকাল ধরা হয় আমাদের দেশে এর সাথে বর্ষা আর হেমন্ত এই দুই ঋতুও যুক্ত করা হয়েছে। এ থেকে বলা যায় ঋতুচক্র আবর্তিত হয় সূর্যের বার্ষিক গতির সাথে, অর্থাৎ সৌর বছরের সাথে সম্পৃক্ত এবং আমরা পাই বছরের হিসাব। আর তিথির পরিবর্তন ঘটে চন্দ্রের গতির সাথে এবং এখান থেকে নির্ণয় করা হয় মাসের হিসাব। ইংরেজি 'Month' শব্দটির অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়-Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে: 'period of moons revolution'-অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্রের আবর্তন কাল। এখান থেকে বোঝা যায় 'Month' শব্দটি 'Moon' থেকে এসেছে। পবিত্র কোরান শরীফের সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে," আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিবস হইতে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস হইল বারোটি (...)। "দিন, সপ্তাহ, ঋতুর পর মাস আর বছরের হিসাব করতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ প্রধানত : তিনটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তিন ধরণের বর্ষ বা সন নির্ধারণ করেছেন। এগুলো হচ্ছে: ১/ সৌর সন বা বর্ষ ২/ চান্দ্র সন বা বর্ষ ৩/ নাক্ষত্র সন বা বর্ষ। আমাদের দেশে প্রচলিত তিন ধরণের সনগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ:

১/ সৌর সন বা বর্ষ বা অব্দ: সূর্যের বার্ষিক গতি অনুসারে যে অব্দ নির্ণীত হয় তাকে সৌর সন বা বর্ষ বা অব্দ বলা হয়। খ্রিষ্টাব্দ হচ্ছে পৃথিবীতে প্রচলিত একটি প্রাচীন সৌর সন যা উত্তর ইউরোপীয় অর্ধ-বর্বর জনগোষ্ঠীর হাতে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এটি একটি আন্তর্জাতিক অব্দ, যা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রচলিত। একে গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারও বলা হয়। আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনামলে এর প্রচলন হয় বলে একে ইংরেজি সাল বলা হয়। ৩৬৫ সৌর দিবস নিয়ে এই সনের সাধারণ বৎসর আর প্রতি চার বছর পরপর অধিবর্ষে থাকে ৩৬৬ টি সৌর দিবস। এই সনের মাসগুলোর নাম যেমন: 'জানুয়ারি' মাসের নামকরণ হয়েছে রোমানদের দ্বিমুখী দ্বাররক্ষক দেবতা জ্যানাসের নামানুসারে। 'ফেব্রুয়ারি' নামের উৎপত্তি ল্যাটিন ভাষা 'Februare' অর্থ্যাৎ 'পবিত্রকরা' থেকে। প্রাচীনকালে যে মাসে পবিত্রকরণ উৎসব পালন করা হতো তার নাম দেয়া হয়েছিল ফেব্রুয়ারি। যুদ্ধ দেবতা 'Mars' এর নাম থেকে মার্চ মাসের নামকরণ হয়েছে। 'এপ্রিল' মাসের নাম ল্যাটিন ভাষার 'Apirere' থেকে এসেছে যার অর্থ 'to open'। এই সময় গাছে গাছে ফুল ফুটে অথবা মাটির বুক ফুঁড়ে গাছপালা গজিয়ে উঠে। দেবতা অ্যাটলাসের কন্যা মাইয়ার নামানুসারে 'মে' মাসের নামকরণ করা হয়েছে। 'জুন' মাসের নামের উৎপত্তি জুপিটারের স্ত্রী জুনোর নাম থেকে। জুলিয়াস সীজারের নামানুযায়ী জুনের পরের মাসের নাম 'জুলাই' এবং তাঁর পালিত পুত্র অগাস্টাস সীজারের নামে 'আগস্ট' মাসের নামকরণ করা হয়। 'সেপ্টেম্বর' নামের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ সেপ্টেম যার অর্থ সপ্তম, 'অক্টোবর' অর্থ অষ্টম, 'নভেম্বর' অর্থ নবম, এবং 'ডিসেম্বর' 'ডেকা' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ দশম। আসলে যখন খ্রিষ্টাব্দের প্রচলন ঘটেছিল তখন বছর শুরু হতো বসন্তের প্রথম ১ মার্চ থেকে এবং শেষ হতো ডিসেম্বরে; বছরে মাস ছিল দশটা, দিন ছিল ৩০৪টি। তখন এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা পর্যন্ত চান্দ্রমাস গণনার রীতি ছিল। ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সীজার এই পঞ্জিকা সংস্কার করে 'জুলাই' এবং 'আগস্ট' মাস অতিরিক্ত সংযোগ করেন এবং তা পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বহাল থাকে। এরপর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে পোপ সেন্ট গ্রেগরি 'ক্রিস্টোফার ক্লেভিয়াসকে' দিয়ে পঞ্জিকা সংশোধন করান, তখন এটা ঋতুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং জানুয়ারিকে প্রথম এবং ফেব্রুয়ারি কে দ্বিতীয় মাস হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় তাই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর তাদের স্থান পরিবর্তন করে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে স্থানান্তরিত হয়। সেই ক্যালেন্ডার এখন সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। ইংরেজি মাসের নামগুলো থেকে বোঝা যায় এদের নামকরণের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, কোনো নিয়ম শৃংখলা নাই; নানা দিক থেকে শব্দ গুলো নিয়ে নামকরণ করা হয়েছে।

২/ চান্দ্র সন বা বর্ষ: চন্দ্রের গতি অনুসারে যে চান্দ্রমাস এবং বর্ষ গণনা করা হয় তাকে চান্দ্র সন বা বর্ষ বলে। প্রাচীনকালে সব দেশেই মাসের হিসাব চাঁদের আর্বতন অনুসারে করা হতো। মানুষ যখন যাযাবর জীবন যাপন করতো তখন সহজ সরল আদিম মানুষ চোখের সামনে দেখতে পেলো চিকণ এক ফালি চাঁদ বাড়তে বাড়তে গোল হচ্ছে আবার ক্ষয় পেতে পেতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে । তাই সে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের এক চাঁদের স্থিতিকালকে অনন্ত সময়ের মধ্যে মেপে নিয়ে 'মাস' নামে ভাগ করে নিল। তারা ভেবেছিল গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীত যে কাল থেকে চাঁদের আকার হিসাবে সময় মাপা শুরু হলো, ঠিক বারো চাঁদ পরে আবার সেই সময়টিতে গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীত এসে উপস্থিত হবে। তাই বারো মাসে বছর গণ্য করা হয়েছিল। চান্দ্র বছর যে ছোট তখনো সে জ্ঞান মানুষের হয় নি। চন্দ্রের অনুপ্রবেশ প্রাতঃকালে হলে ৩৫৪ দিনে এবং রাত্রিকালে অনুপ্রবেশ হলে ৩৫৫ দিনে একচান্দ্রবর্ষ ধরা হয়। পৃথিবীর যেখানে চান্দ্রমাস প্রচলিত সেখানে ৩৫৪ দিন ৯

ঘন্টায় বৎসর হয়। আর সৌরবৎসর হয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায়। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর থেকে ১১-½ দিন কম হয়। এর কারণ চন্দ্র পৃথিবীকে ২৯-½ সৌরদিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ একটি চান্দ্রমাস বা ৩০টি চান্দ্র দিনে ২৯-½ সৌরদিন হয়, আবার এক বৎসরে চন্দ্র পৃথিবীকে বারোবার প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ ৩০x১২=৩৬০ চান্দ্র দিনে একটিচান্দ্র বৎসর। এবার সৌরদিনের সঙ্গে চান্দ্র দিনের পরিমানগত তুলনা করে দেখা যায় একটিচান্দ্র দিন ২৩ ঘন্টা ৩৬ মিনিট অর্থাৎ সৌরদিনের চেয়ে ২৪ মিনিট কম। তা হলে ৩৬০ টি চান্দ্র দিন ৩৬০টি সৌরদিনের চেয়ে ৩৬০x২৪=৮৬৪০ মিনিট অর্থাৎ ৬টি সৌরদিন কম। কিন্তু সৌরবৎসর ৩৬৫-¼ দিনে। সুতরাং ৩৬৫-¼ − ৩৬০ = ৫-¼ দিন + ৬দিন = ১১-½ দিন, অর্থাৎ চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর থেকে ১১-½ দিন কম। অন্যদিকে তিথির হিসাব করলেও দেখা যায় এক চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি থাকে, তিথিগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি চান্দ্রদিন বলা হয়। এদের নাম: অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী এই পনেরো তিথি নিয়ে এক শুক্ল পক্ষ।শুক্ল পক্ষের পরেই হয় পূর্ণিমা। পূর্ণিমা সহ উপরোক্ত চৌদ্দটি তিথি নিয়ে হয় কৃষ্ণ পক্ষ। এক অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা থেকে অন্য অমাবস্যাপর্যন্ত সময়ের নাম চান্দ্রমাস। তিথিকে একটি দিন হিসাবে ধরা হলেও আসলে তিথি ২৪ ঘন্টার দিন থেকে সামান্য ছোট, তাই ৩০টি তিথি মিলে ২৯-½ টি সৌরদিনের সমান হয়। ফলে দেখা যায় চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরের মধ্যে ১১-¼ দিন তফাৎ হয়। উদাহরণ হিসাবে আমাদের দেশসহ আরবদেশগুলোতে প্রচলিত হিজরি সনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পুরাকালে আরবরা মাসের নামগুলো যে বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করেছিল সেগুলো থেকে দেখা যায় যে, এর কতগুলো বৎসরের কোনো বিশিষ্ট ঋতু নির্দেশ করে আর কতগুলো সে সময়ে লোকে কী করতো তা বর্ণনা করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামি বিশ্বকোষ', আলিফ হোসেনের লেখা 'জ্যোতির্বিদ্যা পরিচয়' বই থেকে মাসগুলোর নামের অর্থ জানা যায়। এগুলো হচ্ছে: প্রথম মাস মহররম, 'হুরুম' কথাটি থেকে এসেছে যার অর্থ 'পবিত্র' বা 'সম্মানিত'; তাই এই মাসকে 'আল মহররম' বলা হয়। এই মাসে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, কারবালা ট্র্যাজিডির জন্ম, ফেরাউনের ধ্বংস সাধন, প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) এ মাসে বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন আবার এ মাসেই তাঁরা এক সাথে মিলিত হয়ে ছিলেন, এমনকি পৃথিবীও এই মাসে ধ্বংস হবে: এমনই আরো অনেক কারণে এ মাস ছিল পবিত্র। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এর পরের মাসে জীবিকার সন্ধানে লোকজন দল বেঁধে বাইরে যেতো, দল ধরে যাওয়াকে বলে সাফারিয়া; এখান থেকে এই মাসের নাম হয়েছে সফর . পরের দুইমাসের নাম রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানি; যখন হিজরি সন বিশুদ্ধ চান্দ্র সন হয় নি তখন এই দুইমাস ছিল শরৎকাল। এ সময় গাছ-পালা পুষ্প-পল্লবে ভরে উঠতো, আরবরা এই দুইমাসকে বলতো 'রবি বা বসন্ত', তাই এই রূপ নামকরণ। পরবর্তীতে নাম দুটো বহাল থাকলেও কাল বা ঋতু ঠিক থাকে নি। আরবদেশে পানি জমে যাওয়াকে বলা হয় 'জুমাদা', পরের দুইমাসের নাম এই 'জুমাদা' কথাটা থেকে এসেছে- জুমাদিউল আউয়াল ও জুমাদিউস সানি। এই দুইমাস ছিল শীতকাল। সকালবেলা খুব ঠান্ডা পড়তো, তুষার জমে যেতো। এ কারণে মাস দুইটির এ- রকম নাম দেয়া হয়েছে। পরবর্তী মাসের নাম 'রজব' নামকরণ হয়েছে 'রাজিবতুহ্' কথাটি থেকে, যার অর্থ 'আমি ভয় করতাম'। এটি অতি পবিত্রমাস। আরববাসীরা এ মাসকে ভয় করতো। তারা এমাস আসার আগেই নানা কাজকর্ম সেরে ফেলতো। তখন সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। অন্য আরেকটি সূত্র থেকে পাওয়া যায় রজব অর্থ ঠেকা দেওয়া, এ

মাসে যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা হতো তাই এমন নাম। রজবের পরের মাসের নামকরণ হয়েছে শাবান। এই মাস রাজব ও রামাদানের মধ্যখানে আসে বলে এমন নাম।এর পরের মাস 'রমজান', এটি বছরের নবম মাস, যার নামকরণ হয়েছে 'রযম' শব্দটি থেকে। 'রযম' অর্থ 'পুড়িয়ে দেয়া', এ সময় অসম্ভব গরম পড়তো। রমজানের পরের মাস শাওয়াল, শাওয়াল শব্দটি এসেছে 'শাওলি' থেকে, যার অর্থ 'ভেঙ্গে দাও'। এই সময় গরম বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে বিদায় নিত। এরপর হচ্ছে জ্বিলকাদ মাস। এর নামের অর্থে বলা হয় 'চুপচাপ বসে থাক'। আরববাসীরা এ সময়কে খুব পবিত্র মনে করতো এবং বলতো লড়াই বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে। এর পরের মাস জ্বিলহাজ্জ। এটি হিজরি সনের শেষ মাস, এই মাসে আরববাসীরা পবিত্র হজ্জ পালন করতো। তাই এর নাম জ্বিলহাজ্জ। বর্তমানেও এই মাসে পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। সারা পৃথিবীর মুসলমানগণ এই সন অনুযায়ী তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

৩/ নাক্ষত্র সন বা বর্ষ: রাশিচক্রের মধ্যদিয়ে চন্দ্রের নক্ষত্র পরিক্রমনের সময়কে হিসাব করে যে সন প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে নাক্ষত্র সন বা বর্ষ বলে। কয়েকটি তারার সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি নক্ষত্র। আকাশে নক্ষত্রের মধ্যদিয়ে সূর্যের গতি পথকে বারোটা ভাগে ভাগ করে তার একেকটা ভাগকে নাম দেয়া হয়েছে রাশি বা চিহ্ন। আর এই গতিপথকে বলা হয় রাশিচক্র। রাশিচক্রের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, "কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।"[৩] এই রাশিচক্রে সাতাশটি নক্ষত্র থাকে, প্রতিটি নক্ষত্রে আবার ২-৪ করে তারা থাকে।রাশিচক্রে যে তারাগুলো থাকে তাদের রেখাচিত্র দিয়ে যুক্ত করে কল্পনা করা হয় এক একটি ছবি। কোথাও এই ছবি কোনো প্রাণির, কোথাও ঘর-সংসার বা পরিচিত কোনো বস্তুর। এদের নামানুসারে রাশিগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন। (অনেকে বিশ্বাস করে এইসব রাশির প্রভাব অপরিসীম, এরা ভাগ্য নিয়ন্ত্রক, এদের গণনার মাধ্যমে মানুষের ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব। ইসলাম ধর্ম মতে এসব বিশ্বাস করা শিরক, যা কবীরা গুনাহ্।)[৪]

বিভিন্ন বইয়ে নক্ষত্র গুলোর নাম পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে: অশ্বিনী,ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তারাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্র পদা, এবং রেবতী। চন্দ্র সাতাশ দিনে বারো রাশি ও উক্ত সাতাশ নক্ষত্র একবার ঘুরে আসে এবং তিন দিন বিশ্রাম গ্রহণ করে। সূর্যের সেই রাশিচক্রের উপর দিয়ে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে এক বছর। তাই চন্দ্রের নক্ষত্র পরিক্রমনের সময়কে বলা হয় মাস আর সূর্যের নক্ষত্র পরিক্রমনের সময়কে বলা হয় বৎসর। চাঁদের এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা আসতে সময় লাগে ৩০ দিন। তাই ৩০X১২= ৩৬০ দিনে এক নাক্ষত্র সন হয়।

বাঙালি যেমন সঙ্কর জাতি তেমন বাংলা সনও একটি সঙ্কর অব্দ। এই সনের মাস গুলোর নাম কোন আমল থেকে প্রচলিত তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। তবে এগুলোর নামকরণে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালি অবলম্বন করা হয়েছিল। আমরা জানি সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুরে আবার সূর্যের চারিদিকে অক্ষ পথে ঘুরে। এই কারণে দিন-রাত্রি, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, শুক্ল পক্ষ-কৃষ্ণ পক্ষ ও বিভিন্ন ঋতুর আগমন ঘটে। বাংলা মাসের নামকরণের ব্যাপারে 'সূর্য সিদ্ধান্তে' বলা হয়েছে- "নক্ষত্র নাম্না মাসাস্তু জ্ঞেয়া : পর্বান্ত যোগতঃ"[৫] অর্থাৎ যে নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়, অথবা পূর্ণিমার চাঁদ রাশিচক্রের যে নক্ষত্রের উপর থেকে পূর্ণিমা দেখায় সেই

নক্ষত্রের নামানুযায়ী বাংলা মাসের নামকরণ করা হয়েছে। কারণ চন্দ্রমাসের অন্যান্য দিনের চেয়ে পূর্ণিমার দিন সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ণিমার সময় সূর্য চন্দ্রের বিপরীতে অবস্থান করে। বাংলা সনের মাসগুলোর নাম নির্ণয়ের জন্য বছরকে বারোটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাক্ষত্র সনের নিয়মানুযায়ী সূর্যের একটি রাশির এলাকা পার হতে যে সময় লাগে তাকে ধরা হয় মাস। সূর্য তার আবর্তনকালে যখন মেষ রাশিতে প্রবেশ করে চন্দ্র তখন বিশাখা নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে পার হওয়ার সময় পূর্ণিমা দৃষ্টিগোচর হয় তাই এই মাসের নাম বৈশাখ। মেষ রাশি পার হয়ে সূর্য বৃষ রাশি দিয়ে আবর্তনকালে চন্দ্র অনুরাধা নক্ষত্র পার হয়ে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা দেখায়। সেজন্য এই মাসকে জ্যৈষ্ঠ নাম দেয়া হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হলে পরবর্তী পূর্ণিমার অন্ত হয় পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সূর্য তখন মিথুন রাশি অতিক্রম করে তাই জ্যৈষ্ঠের পরের মাসের নাম আষাঢ়। মিথুন রাশি পার হয়ে সূর্য কর্কট রাশিতে প্রবেশ করার সময় চন্দ্র পূর্বাষাঢ়া, উত্তারাষাঢ়া পার হয়ে শ্রবণা নক্ষত্রে প্রবেশ করে এবং পূর্ণিমা প্রদর্শন করে। সে কারণে এই মাসকে শ্রাবণ বলে। সূর্য কর্কট রাশি পার হয়ে সিংহ রাশি পথে পরিভ্রমনকালে চাঁদের পূর্ণিমা হয় পূর্ব ভাদ্রপদা নক্ষত্রে অবস্থানকালে। এই জন্য এই মাসের নাম ভাদ্র। সূর্য এরপর প্রবেশ করে কন্যা রাশি পথে আর চন্দ্র উত্তরভাদ্র পদা এবং রেবতী পার হয়ে অশ্বিনী নক্ষত্র অতিক্রমকালেপূর্ণিমা দেখায়। ভাদ্রের পরের মাসের নাম তাই আশ্বিন দেয়া হয়েছে। কন্যা রাশি অতিক্রম করে সূর্য তুলা রাশিতে আগমন করে। চন্দ্রের অবস্থান যখনভরণী পার হয়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে তখন এখানেই পূর্ণিমার অন্ত হয় বলে এ সময়কে কার্তিক মাস বলা হয়। তুলা রাশি পার হয়ে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে আর চন্দ্রের রোহিনী পেরিয়ে মৃগশিরা নক্ষত্রে অবস্থানকালে পূর্ণিমা হয় এই মাসের নাম মার্গশীর্ষ হলেও অগ্রহায়ণ এর নামান্তর। এই মাসে শস্যের প্রাচুর্যের কারণে ক্ষেতের সৌন্দর্য বর্ধিত হয়। সংস্কৃতে 'হায়ণ' এর অর্থ 'বৎসর'। সে জন্য বৎসরের অপরাপর মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অগ্র) বলে এই মাসের নাম অগ্রহায়ণ হয়েছে প্রচলিত মতানুসারে অগ্রহায়ণ অর্থ বৎসরে অগ্র; অর্থাৎ অতীতের কোনো এক সময় অগ্রহায়ণ ছিল বৎসরের প্রথম মাস। অগ্রহায়ণ মাসের পর সূর্য ধনুরাশি দিয়ে পরিভ্রমন করে; চন্দ্র আর্দ্রা, পুনর্বসু পেরিয়ে পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থানকালে পূর্ণিমা দেখায় বলে এই মাসের নাম পৌষ। ধনুরাশি পার হয়ে সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশ ঘটে আর চাঁদ অশ্লেষা শেষে মঘা নক্ষত্র দিয়ে ভ্রমনকালে পূর্ণিমা ঘটে। ফলে পৌষের পরের মাসের নাম দেয়া হয় মাঘ।এরপর সূর্য কুম্ভ রাশি অতিক্রমের সময় চাঁদের পূর্ণিমা হয় পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে তাই মাঘ মাসের পরের মাস ফাল্গুন। সূর্যের রাশিচক্রের সর্বশেষ রাশিপথ মীন; এই রাশিপথে চলাকালে চাঁদের পূর্ণিমা হয় চিত্রা নক্ষত্রে এ কারণেএই মাসের নামকরণ করা হয়েছে চৈত্র।

বাংলা মাসগুলোর নামের অর্থ বিচার করলে অগ্রহায়ণকে বৎসরের প্রথম মাস বলে ধরা উচিত। কিন্তু বৈশাখকে বৎসরের প্রথম মাস ধরার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, যখন বাংলা সন প্রবর্তন করা হয় তখন বৈশাখ মাস ছিল বলে সেটিকেই বৎসরের শুরু হিসাবে ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. সূরা 'আর-রাহমান' ৫ নং আয়াত।

২. সূরা বণী ঈসরাইলঃ আয়াতঃ ১২।

৩. সূরা- ফুরক্বান, আয়াত-৬১

৪. তথ্যসূত্রঃ সূরা- আনআম,* আয়াত-৬৩-৬৪। সূরা- মায়িদাহ,** আয়াত-৯০। মুসলিম, সুত্রঃ মিশকাত***, পৃষ্ঠা-৩৯৩। রাজীন, সুত্রঃ মিশকাত, পৃষ্ঠা-৩৯৪।)

৫. মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, 'প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা' বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল-জুন ১৯৭৬।

জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দকোষ ফারসীম মান্নান মোহাম্মাদী (১৯৭৫-০), পৃষ্ঠা-১২২। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশ-ফাল্গুন-১৪০৪/ফেব্রুয়ারি-১৯৯৮। সত্যেন সেনের(১৯০৭-১৯৮১) লেখা,' বিশ্ব পটভূমিতে বাংলা মাস-তালিকা', বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ, পৃষ্ঠা-৯৯।

আলীফ হোসেন (১৯৭৭-০), জ্যোতির্বিদ্যা পরিচয়, সংহতি, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ । প্রকাশকাল- মাঘ ১৪১৪/ জানুয়ারি ২০০৮।)

প্রবন্ধকার : প্রভাষক, জীববিজ্ঞান, ধরমপুর মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

আমাদের শহরে সবজি ও ফল চাষ

কে এম আলী রেজা হেলাল

বাড়ীর ছাদে ও আঙ্গিনায় কি ভাবে চাষ করবেন

বর্তমানের ঢাকার লোক সংখ্যার পরিমান অন্য সব শহরের তুলনায় অনেক গুন বেশি। আগে এই গোটা বাংলাদেশে আবাদী জমির পরিমান ছিল অনেক বেশি আর এখন এই অতি জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারনে কমে গিয়েছে ৩০ শতাংশ। অপর দিকে নদীতে পানির অভাবে চর পড়েছে, চরম ভাবে ব্যাহত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন, লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন কমেছে। আর আমাদের জনসখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের খাদ্যের চাহিদাও বেড়েছে।

সেই জন্য আমাদের দেশে এখন হাইব্রিড ফসল উৎপাদন হচ্ছে বেশি, কৃষকও এরকম চাষে লাভবান হয় বেশী। আর অন্য দিক হচ্ছে একই জমিতে বহুমূখী ফসলের চাষও হচ্ছে। তাই এই সব সমস্যার সমাধান যতটুকু পারা যায় আমাদের বের করতে হবে এবং এর সমাধান করতে হবে। আর আমাদের ঢাকা শহরে যে পরিমান গাড়ী চলে, চুলা জ্বলে, আর সেই সাথে যা কোন মতেই থাকার কথা নয়, গ্রহন যোগ্য নয়-সেই অপরিকল্পিত কলকারকানা যেমন প্রধান চামড়ার ট্যানারী। তাপমাত্রা বাড়ার কারণ হলো কলকারখানা, অতিমাত্রায় গাড়ী ও সেই সাথে চুলার গ্যাস। শহরের ছাদে সবজি বাগান মানে হচ্ছে কিছুটা হলেও এই তাপমাত্রা কমবে। এসবের কারনে বাতাস ও পানি চরম ভাবে দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শুধু এই কারনে শহরের প্রতিটি শিশুর জন্ম হতে শ্বাস কষ্ট নিয়ে জন্মায় যা গ্রামে নেই। ইউরোপিয়ান এক জর্নালে বলা হয় প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের শিশু গর্ভে থাকা অবস্থায় শ্বাস কষ্টের রোগ নিয়েই জন্মায়, কারন হিসাবে বলা হয়েছে মা যখন এই শহরে শিশু গর্ভে ধারন করেন তখন সে এই ধুষিত বাতাস গ্রহন করেন আর এই দুষিত বাতাস হতে অতি মাত্রায় শিশা ও কার্বন-ডাইক্সাইড গ্রহণ করেন যা তার রক্তের মাধ্যমে গর্ভে থাকা শিশুর রক্তে সঞ্চালিত হয় আর মায়ের গর্ভে শিশু থাকা অবস্থায়ই শিশুটি শ্বাস কষ্টের রোগী হয়ে জন্মায়। আরো সবচেয়ে বিপদের কথা হলো প্রতিটি সবজি ও ফল-মূলে ব্যবহার হয় কৃত্রিম রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, সেই সাথে আছে খাদ্যে বিষক্রিয়া।

এই শহরে থেকেই যদি আমরা কিছুটা হলেও প্রতিদিনের বিষমুক্ত কিটনাশক মুক্ত শাক-সবজীর চাহিদা পূরণ করতে পারি তাহলে মন্দ কি? আমাদের এই বর্তমান খাদ্য সমস্যার যদি সামান্যতম সমাধান করা যায় সেই সাথে আমরাও বিজ্ঞান সম্মত ভাবে এর সমাধান করে দেশের প্রতিটি কনা মাটির সঠিক ব্যবহার করতে পারি তবে অবশ্যই কিছু কিছু করে অনেকটাই সমাধান হতে পারে। এরপর আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের দেশে এমন সব জায়গা আছে যা আমরা কোন রকম ব্যবহার করছি না বা এমন কিছু জায়গা আছে যা কোন দিনও ফসল বা সবজি উৎপাদনে ব্যবহার হবেনা। তবে এর কিছু অংশ ব্যবহার হচ্ছে সেটুকু হচ্ছে শহরের কিছু কিছু বাড়ীর ছাদ, তবে সব বাড়ীর ছাদ নয়, কারন অনেকের ধারনা এতে ছাদের ক্ষতি হয় তাই তাদের ছাদ সবজি চাষে ব্যবহার করেন না। আবার হয়তো অনেকে ভালো করে জানে না কি ভাবে বাসা বাড়ীর ছাদে বা বারান্দায় অথবা অন্য সব জায়গায় এই সবজি বাগান করা যায় বা হয়। আর গাছ বা সবজির বাগান করতে হলে মাটি কোথায় পাবেন বা টব কোথায় পাবেন? আপনার গাছ লাগাবার জন্য মাটির টব

লাগবে এমনটা নয় বরং আপনার বাড়ীতে প্রতিদিন যে পরিমান সাক-সবজীর আবর্জনা তৈরী হয় এটাই আপনার জৈব সার এবং উন্নত সার আপনি চাইলেও এক বছরের আবর্জনা দিয়ে একটি ছোট বালতী ভরতে পারবেন না। আর এটা যদি আপনি করেন তা হলে আপনার ময়লা ফেলার টাকাটা বাচতে পারে। আপনি ফেলনাযোগ্য , কাচ, লোহা, প্লাস্টিক, কাগজ আলাদা ভাবে জমালে বিক্রি করতে পারেন। আপনার চা-পাতার অংশ এই সবজীর মাঝে জমা করুন। কিভাবে করবেন: প্রথমে আপনি একটি ভাংগা বালতী বা তেলের পাত্রের উপরের অংশ অথবা বাজার হতে তিন চারটি ফলের প্লাস্টিকের ঝুড়ি জোগাড় করতে হবে এবং এগুলো বাড়ীর ছাদে অথবা যেখানে রোদ পড়ে এমন জায়গায় রাখতে হবে। এই পাত্রে প্রতিদিনের ময়লা জমা করুন দ্বিতীয় দিনে পরের পাত্রে জমা করুন। এ ভাবে অদল বদল করে রাখুন যাতে করে তাঁড়াতাঁড়ি এগুলো শুকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে যদি একটু মাটি মিশিয়ে দেন তবে ভালো হবে। এ গুলো অনেক পরিমান হলে একটি বালতী বা ফলের ঝুড়িতে জমা করুন। অতপর: এটির ভেতর চাইলে আপনি লাউ,কুমড়ো সিম, ঠেড়ষ, বেগুণ, আম, পেপে, লেবু যে কোন গাছ লাগাতে পারেন। কি ভাবে এই সবজির উচ্ছিষ্ট গুলি জমাবেন, ছবিতে দেখুন। শুকিয়ে গেলে এর সাথে মাটি মিশিয়ে নিতে হবে। এর নিচে সিমেন্টর বস্তা কেটে বিছিয়ে দিতে হবে।

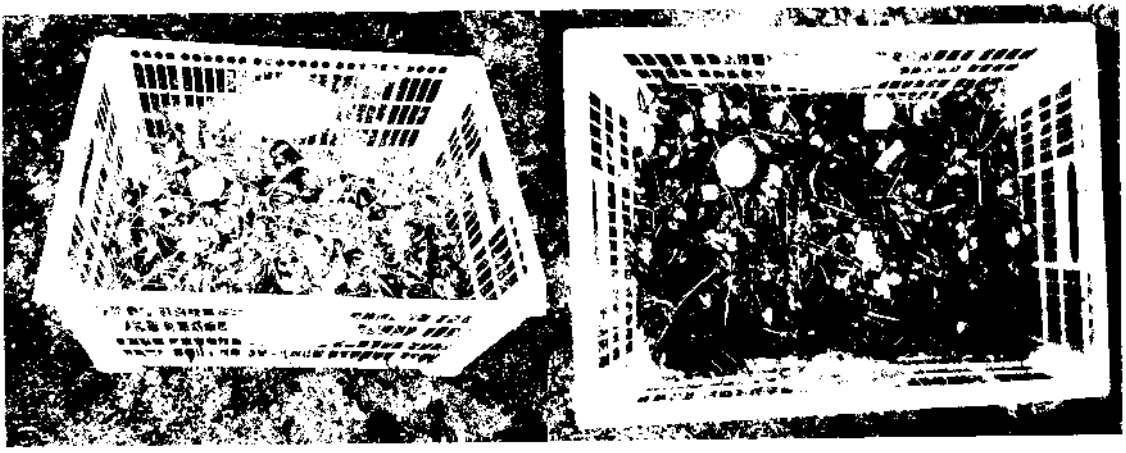

এই বক্স গুলো বাজারে মাত্র ৩০ টাকা দাম আর এর চেয়ে বড় গুলো ৯০ টাকা দাম এবং এ গুলো বহু বছর টিকে এই বক্স গুলো ফলের দোকানে পাবেন। আর মাটির টব এর চেয়ে দিগুন দাম আর এই মাটির টব যেকোন সময়ে ভেঙ্গে যেতে পারে তাই এগুলো ভালো। অপর দিকে বাড়ীতে নষ্ট বালতী তেলের কনটেইনারও এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার বড় ফলের গাছ লাগাতে হলে আপনি চাইলে বাজার হতে বড় সাইজের তেলের ড্রাম কিনতে পারেন অবশ্যই এটাকে মাঝ থেকে কেটে দুটি করে নিতে হবে . মনে রাখতে হবে এটির নিচে চার পাচটি ছিদ্র থাকতে হবে এবং এই ছিদ্রগুলো যেন বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্য ছিদ্রের উপর ভাংগা টবের চাড়া বা ছোট ইটের টুকরো দিতে হবে আরো ভালো হয় যদি আপনি কিছু বালি ও ইটের শুরকি নিচে বিছিয়ে দিতে পারেন, এই শুরকি সুধু বড় ড্রামের জন্য। পারলে এই ড্রাম বা বালতীর উপরিভাগে কিছু ছিদ্র করে দিতে হবে তাহলে বায়ু প্রবেশ হতে বাধা থাকবে না। আর আপনি যখন সবজি বা ফল গাছ লাগাবেন তখন এই সবজির বর্জ্যগুলোর সাথে সামান্য বা সমপরিমান মাটি মিশিয়ে নিবেন। অপর দিকে

গাছের ফলন বেশি করতে হলে সার প্রয়োজন নেই এটি অনেক [illegible] গাছের ফলন [illegible] করাতে হলে প্রয়োজনে বাজার থেকে তেলের শুকনো খৈল কিনে এটিকে [illegible] ২০ দিন [illegible] হবে। অত:পর এই পচা পানি গাছের চারিপাশে মাটি সরিয়ে ঢেলে দিতে [illegible] ভালো [illegible] আপনার বাসায় যে ভাতের মাড় হয় এটি ফেলে না দিয়ে এর সাথে চার পাচ [illegible] গাছের [illegible] আরো বেশি উপকার হবে গাছের ফলন অনেক বেশি হবে। চা বানানোর পর [illegible] রোদে শুকিয়ে সামান্য মাটি মিশিয়ে গাছের মাটিতে দিতে পারেন তাতেও [illegible] হবে [illegible] আপনার প্রতিদিনের সবজির চাহিদা মিটবে, আবার আপনার সবজির [illegible] কাজে [illegible]

এখন একটু ভেবে দেখুন আপনার বাড়ীর চার পাশে এমন অনেক জায়গা আছে যা আপনি [illegible] ব্যবহার করছেন না অথচ এই জায়গা গুলো একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবহার করলে আপনার বাড়ীর [illegible] অনেক বাড়বে। বাড়ীতে অক্সিজেনের পরিমান বাড়বে। কারন গাছ দিনের বেলায় [illegible] অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন প্রদান করে। এই জন্য রাতের সময়টাতে ঘরের ভেতর গাছ না রাখা ভালো। [illegible] বাড়ীর সামনের রাস্তা যেখানে সব সময় গাড়ী চলাচল করে না এমন জায়গা গুলো [illegible] টব বা [illegible] বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। কারন মুভিং ট্রে বা বেড গুলো যে কোন সময়ে [illegible] সরিয়ে [illegible] করা যায়। এটি হচ্ছে মাল্টি বেড ট্রের ডিজাইন। মনে রাখবেন এই ডিজাইনের ট্রে [illegible] বানিয়ে নিতে [illegible] তবে আপনি অল্প পরিমান জায়গাতে দুই বা চারগুণ পরিমান সবজি চাষ [illegible]। [illegible] ট্রে [illegible] চাইলে আপনি লাউ, কুমড়া, পুইপাতা, চালকুমড়া,করোলা, শসা, বরবটি [illegible] অনেক [illegible] গাছের চারা লাগাতে পারবেন।

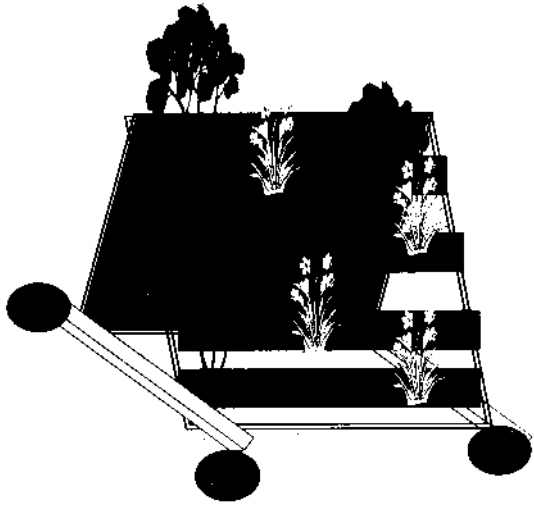

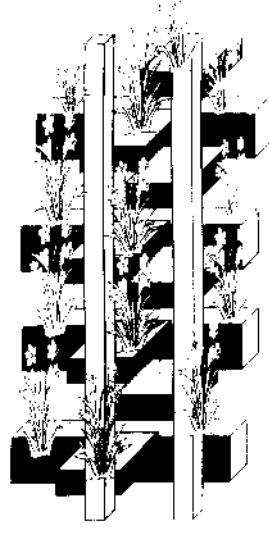

যাই হাইব্রিড বেড যা আপনি বানিয়ে নিলে অল্প জায়গাতে অনেক [illegible] পারবেন

এগুলোর নিচে চারটি করে চাকা লাগিয়ে নিলে আপনি চাইলে দিনের [illegible] রোদে রাখতে [illegible] আবার প্রয়োজন অনুসারে সরিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় কাজ সারতে পারবেন [illegible] আপনার বাসার সামনের গাড়ী

প্রবেশের রাস্তাটি এই নিয়মে ব্যবহার করতে পারেন আবার প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে সরিয়ে রেখে আসতে পারবেন। এছাড়া আমাদের ঘর বাড়ীর অনেক স্থান আছে যেমন রিজার্ভ বা সেফটি ট্যাংক। তাই আমি চাই আমাদের এই সকল জায়গার সব টুকুই আমাদের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হোক। আমি চাই শহরও হয়ে উঠুক আমাদের সবজি উৎপাদনের বাগান।

ছাদে বাগান করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ছাদের বা বারান্দার কোন ক্ষতি না হয়। সেজন্য রোপনকৃত গাছের টব বা বালতী গুলো যেন কোন ইট বা রিং এর উপর বসানো হয় এত করে ছাদে ড্রাম্প পড়বে না আবার এই টবগুলোর নিচদিয়ে প্রচুর পরিমান আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারবে এতে করে ছাদ স্যাঁতসেতেঁ হবেনা বা ছাদ কখনো ভেজা থাকবেনা। প্রতিদিন গাছের যত্ন নিতে হবে দুবেলা বা বিকালে পানি দিতে হবে বা প্রয়োজন অনুযায়ী। যদি আপনি কখনো পানি দিতে না পারেন তা হলে বাজার হতে বড় সাইজের গামলা কম দামের গুলো এই সব টবের নিচে বসিয়ে দিতে পারেন আর এর মাঝে পানি ভরে দিলে গাছ সারা দিন এই গামলা হতে তার প্রয়োজনীয় পানি টেনে নিবে যেমন আর টবের নিচের ছিদ্র হতে পানি বেরিয়ে আপনার ছাদ নষ্ট করতে পারবে না। নিচে দেখুন কি ভাবে আপনার ফেলনা জিনিস গুলো দিয়ে গাছ লাগাবেন। এ রকম ভাবে বাসার পুরান বালতি যেগুলো ব্যহারের অনুপযোগী সেগুলোকে এই ভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

উপরের ছবিতে দেখুন কিভাবে কাটতে হবে। এমনি ভাবে পুরান বালতিও ব্যবহার করতে পারেন এর মাঝে আপনার বাসার সবজির আবর্জনা, চা পাতা ফেলে না দিয়ে ভালো জৈব সার তৈরী করে এর ভিতর দিতে পারেন। আমাদের বাসা বাড়ীর খোলা জায়গাটুকু আমাদের প্রতিদিনের সবজির চাহিদা পূরণে যদি কাজ লাগে তবে আমাদের এই বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধান নেওয়া উচিত। যে দেশ যত বিজ্ঞানের সকল সুবিধা নিয়েছে এবং এর প্রয়োগ করেছে সেই দেশ তত বেশী উন্নতি লাভ করেছে।

হাইড্রোপনিক উপায়ে চাষাবাদ-

এটি একটি চমৎকার চাষ পদ্ধতি যা আমাদের দেশে প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে এই হাইড্রোপনিক একটি অত্যন্ত লাভজনক ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি। অতি আধুনিক ও লাভজনক ফসলের জন্য এই হাইড্রোপনিক পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মাটির পরিবর্তে পানিতে গাছের সব প্রয়োজনীয় খাবার পেয়ে থাকে এবং এই ভাবেই ফসল উৎপাদন হয়।বেশ মজার এই চাষ পদ্ধতি আপনার বাসায় গাছ লাগাতে আর মাটির প্রয়োজন হবেনা। লাগবে শুধু পানি যদিও আমি এটির ব্যবহার করেছি আজ হতে ৪৫ বছর আগে শুনতে অবাক মনে হতে পারে কিন্তু তখন এটা জানতাম না যে এই পদ্ধতিতে শাক-সবজীর চাষ করা যায়। তখন আমি পানিতে ফুলের গাছ লাগাতাম। আর এখন হবে আপনার প্রয়োজনীয় শাক-সবজীর ফলন। আপনি যে সবজী চাষ করবেন তার চারা আগে মাটিতে উৎপন্ন করে নিতে হবে। অতঃপর এটিকে পানির মাঝে বসিয়ে দিতে হবে আবার কিছু গাছ পানিতেও সরাসরি হয়। এই পদ্ধতিতে সব সময় মানে সারা বছর ফসল উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার কীট নাশক ব্যবহার করা হয় না। সাধারনত দুটি উপায়ে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। ১) সঞ্চালন পদ্বতি (Circulating System) এবং ২) সঞ্চালন বিহীন পদ্বতি (Non-circulating system)। সঞ্চালন পদ্ধতিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য বা উপাদানসমূহ সঠিক মাত্রায় মিশ্রিত করে নেওয়া হয়। অতঃপর একটি ট্যাংক হতে এই পানি ট্রেতে সঞ্চালন করে ফসল উৎপাদন করা হয়। আর সঞ্চালন বিহীন পদ্ধতিতে ট্রেতে পরিমিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় উপাদান মিশিয়ে সরাসরি ফসল উৎপাদন করা হয়। তবে পানি সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়না। তবে ফসলের ধরন অনুযায়ী ২ থেকে ৩ বার এই মিশ্রন ট্রেতে আমাদের দেশে যে পরিমান চাষ হয় তা অতি সহজেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্লাস্টিকের পাত্র, বালতী, বড় পানির বোতল, বড় তেলের বোতল, মাটির পাতিল বা পাত্র অথবা বড় তেলের ড্রাম কেটে নিয়ে বাড়ীর ছাদে বা অন্য খোলা জায়গায় সবজি চাষ করা যায়। আপনি চাইলে আপনার গ্রামের অনাবাদী জমিতে এই চাষ করে অতি সহজেই লাভবান হতে পারেন যা উন্নত বিশ্বে প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশে এই পদ্ধতিতে আপনি আপনার ঘরের মাঝেও চাষ করতে পারেন তবে এই ক্ষেত্রে আপনাকে এলইডি লাইট ব্যবহার করে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে আপনি ক্যাপসিকাম, লেটুস, শসা, টমেটো, ক্ষীরা ও স্ট্রবেরী চাষ করতে পারেন। আরো বলে রাখা ভালো যে সব গাছের শিকড় পানিতে পচেনা সেরকম গাছ আপনি এই হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষ করতে পারেন তা-সে ফল হোক আর যেকোন ফুলের বা পাতা বাহারের গাছ হোক। এই ব্যবস্থাটি বুঝতে হলে আপনাকে এখানে দেওয়া চিত্র বা ছবি হতে খুব সহজ করে বুঝতে পারবেন। অপর দিকে যে সকল জায়গা শুধু গাড়ী বা লোকজন যাবার জন্য ব্যবহার হচ্ছে সে রকম জায়গা নিয়ে কিছু বেড তৈরী করতে পারেন। কারন হচ্ছে আমাদের শহরে এমন অনেক বাড়ী রয়েছে যেখানে দিনে মাত্র অল্প সময়ের জন্য রাস্তাটি ব্যবহার হয় অথবা একদম ব্যবহার হয়না অথচ রাস্তার এই জায়গাটি এমনি পড়ে রয়েছে। আপনি চাইলে এই জায়গা গুলির সঠিক ব্যবহার করতে পারেন এবং বাড়ীর রির্জাভ ট্যাংক বা সেফটি ট্যাংকের উপরি ভাগও আপনি ব্যবহার করতে পারেন এই সবজী বাগানের জন্য। এখানে যে যে গাছ গুলি ছাদে চাষ করা যাবে বা রোপন করা যাবে তার একটি তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে এর হতে হয়তো সব গুলি নাও রোপন করতে পারেন, তবে যেটি আপনার জন্য সহজ মনে হয় সেটি করবেন। যেমন ঢেড়স, মরিচ, পেপে, কলা, লাউ, পটল, শসা, ঝিঙ্গা, পুই, ধনে, লেটুস পাতা, আখ, ওল, মানকচু, গাছ আলু, বেগুন, টমেটো, শিম, বরবটি, কলমি, পাটশাক, লালশাক, ডাটা, কাকরোল, পান, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়ো আর ফল হচ্ছে জামরুল, পেয়ারা, লিচু, আম, কামরাঙ্গা, লটকন, লেবু,কমলা, কুল বরই ইত্যাদি।

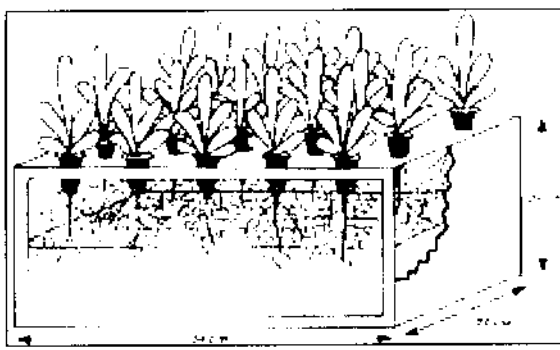

আপনি মাটি ছাড়া এক টুকরো ফোমের উপরিভাগে বীজটি ভরে দিয়ে পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে চারা উৎপাদন করতে পারেন, যাতে করে ফোমটি ডুবে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কি কি দিয়ে দ্রবন তৈরী করা যায়, প্রথমে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং ইডিটিএ আয়রন কে পরিমাপ করে ১০ লিটার পানিতে মিশাতে হবে এটির নাম দিবেন "এ"। তারপর বাকি রাসায়নিক দ্রব্যগুলোকে এক সাথে ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে আরো একটি দ্রবন তৈরী করে এটির নাম দিবেন "বি"। এখন ১০০০ লিটার পানির ভিতর "এ" হতে ১০ লিটার ও "বি" হতে ১০ লিটার নিয়ে ভালো করে পানির মিশ্রন তৈরী করে নিতে হবে। (মিশ্রনটির পরিমাপ কৃষি বার্তা হতে সংগৃহীত)

রাসায়নিক নাম	পরিমান
পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট	২৭০ গ্রাম
পটাসিয়াম নাইট্রেট	৫৮০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৫১০ গ্রাম
ইডিটিএ আয়রন	৮০ গ্রাম
ম্যাঙ্গানিজ সালফেট	৬.১০ গ্রাম
বরিক এসিড	১.৮ গ্রাম
কপার সালফেট	০.৪ গ্রাম
জিংক সালফেট	০.৪৪ গ্রাম
এমোনিয়া মলিবটেড	০.৩৮ গ্রাম
ক্যালসিয়াম সাইট্রেট	১০০০ গ্রাম

ছাদে বাগান করলে যে সুবিধাগুলো আপনি পেতে পারেন।

- আপনি ছাদে বাগান করলে তাজা ফল ও সবজি পাবেন।
- বাড়তি আয় ও অবসর সময় কাটাতে পারবেন।
- যখন বৃষ্টি হবে তখন আপনি বড়তি সুবিধা পাবেন।
- আপনার ছাদের বাগানে পাবেন সবুজের এক চত্তর যেখানে আপনি সময় কাটাতে পারবেন অতিথির সাথে বসে চায়ের সাথে সুন্দর পরিবেশ পেতে পারেন।
- আপনার ছাদ যেমন ঠান্ডা থাকবে তেমন শহরের তাপমাত্রা কমতে উপকার আসবে।
- বাতাসে অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্বি পাবে।
- আপনার জমি নেই কিন্ত এই ছাদের বাগানের ব্যবহারে সেই উপকার টুকু পুষিয়ে নিতে পারবনে।
- আপনার চারিপাশে কার্বনডাইক্সাইডের পরিমান কমে যাবে সেই সাথে ঢাকা শহরের।
- আপনার অবসর সময় গুলো এই বাগানে কাটাতে পারেন যেহেতু সেই কারনে আপনি আপনার ব্যবসায়িক বা লেখালেখির কাজ বা হাতের কাজ গুলোও এই সুন্দর পরিবেশে করে নিতে পারেন।
- আপনার বাড়ীর আঙ্গিনার বাড়তী যে জায়গা গুলো এতদিন ব্যবহার হয়নি সেই জায়গা গুলোতে সবজী বা ফল-মূল গাছ লাগানোর ফলে আপনার বাড়ীর পরিবেশ অনেক সুন্দর হবে সেই সাথে আপনি লাভবান হবেন।

প্রবন্ধকার : সভাপতি, বাংলাদেশ ইয়ং সাইনটিস্ট কংগ্রেস ১৫৩, বি, বি, জাতীয় স্টেডিয়াম, ২য় তলা, ঢাকা।

বিজ্ঞান ও মানুষ

অশোক কুমার নাথ

কয়েক হাজার বছর আগেও
খাইতাম আমরা কাঁচা মাছ-মাংস
আগুন আবিস্কারের পর
ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে
আমাদের জীবন আর বংশ।
আশি বছর আগেও পান করতাম
খাল-বিলের জল,
যত্র তত্র ত্যাগ করতাম
মূত্র আর মল।
এককালে জ্বরায়, মরায়, খরায়
কষ্ট করেছি কত,
এখন মোদের উন্নত স্বাস্থ্য
নানা জাতের শস্য ও ফসলাদি
ফলাই মনের মত।
বিজ্ঞান পাল্টে দিয়েছে
পুরানো আচার আচরণ
বাড়িয়ে দিয়েছে মোদের বল
দৈনন্দিন জীবন যাপন করছি সুন্দরতর
প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের নানা কলা কৌশল,
এসবই বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফল।
পূর্বে কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা হলে
হতোই না রক্ষা।

BANSDOC Library
Dhaka

কিন্তু এখন এসব আমাদের আয়ত্বে
শীঘ্রই হয়তো Cancer এরও পাওয়া যাবে Answer
হয়তো, এটা আমি দেখে যেতে পারবো না একটি বার।
বিমানে করে এখন একমাসের পথ
দু'এক ঘন্টায় দেই পাড়ি,
ভূ-পৃষ্ঠ ছেড়ে আজ মঙ্গল ও চন্দ্রালোকে
করতে চাইছি ঘরবাড়ি।
ছোটকালে, রেডিও দেখে আর শুনে
কত না অবাক হয়ে থাকি,
এখন টিভির পর্দায় সারা দুনিয়াটা পলকে
দেখে জুড়াই দুটি আঁখি।
Transmission & Reception চলে
একই যন্ত্র Mobile এ
ক্ষণিকেই কথা বলতে পারি
বিশ্বের যেকোন স্থানে, চাইলে।
এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিতো সেই
মহা শক্তিরই অংশ আর অবদান,
শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে সবাইকে
করতে হবে সেই মহাশক্তিরই ধ্যান।

লেখক : সম্পাদক, জয়দেবপুর বিজ্ঞানক্লাব পাঠাগার সাহাপাড়া, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীবস্তুসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যক
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকিটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

BANSDOC Library Dhaka

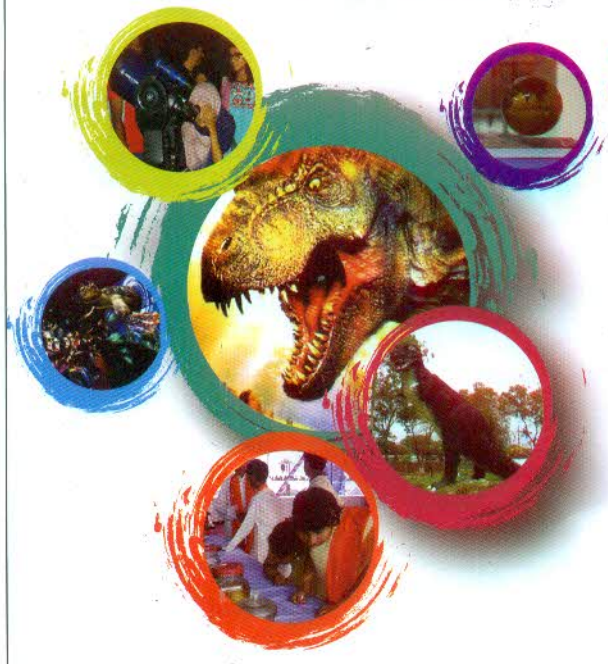

▶ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের সময়সূচি

- রবিবার থেকে বুধবার সকাল ৯:০০ থেকে বিকাল ৫:০০
- শনিবার সকাল ৯:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০
- শুক্রবার দুপুর ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:০০
- বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

▶ নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘরের গ্যালারি খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য 4D movie প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৮১৮১৩২৮